ব্রহ্মচর্য্য-সাধন

নিগমানন্দ

4NK G. N. Sikdar
270 COY ASC (SUPPLY)
C/O 99 A.P.O

সারস্বত গ্রন্থাবলী—সংখ্যা ১

ব্রহ্মচর্য্য-সাধন

অর্থাৎ

ব্রহ্মচর্য্য-পালনের নিয়মাবলী

——০:*:০——

কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষতে॥

পরিব্রাজকাচার্য্য পরমহংস
শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী
প্রণীত

প্রকাশক

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

সারস্বত মঠ

হালিসহর, ২৪ পরগণা

পশ্চিমবঙ্গ

[প্রথম সংস্করণ—১৩১৭, দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩২১
তৃতীয় সংস্করণ—১৩২৪, চতুর্থ সংস্করণ—১৩২৬, পঞ্চম সংস্করণ—১৩২৭,
ষষ্ঠ সংস্করণ—১৩২৯, সপ্তম সংস্করণ—১৩৩১, অষ্টম সংস্করণ—১৩৩৩,
নবম সংস্করণ—১৩৩৪, দশম সংস্করণ—১৩৩৬, একাদশ সংস্করণ—১৩৪৪,
দ্বাদশ সংস্করণ—(২০০০)—১৩৫৫, ত্রয়োদশ সংস্করণ—(২০০০)—১৩৬৮,
চতুর্দ্দশ সংস্করণ—(৩০০০)—১৩৭২, পঞ্চদশ সংস্করণ—(৩০০০)—১৩৭৮]

ষোড়শ সংস্করণ ৫০০০—১৩৮৩

চত্বারিংশ সহস্র

মুদ্রাকর

শ্রীঅমলেন্দু শিকদার

জয়গুরু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৩/১, মণীন্দ্র মিত্র রো, কলিকাতা-৯

শ্রী ১০৮ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ তৎসৎ

উৎসর্গ

অতীত যুগের

ঋষিগণের মঙ্গলাশীর্ব্বাদস্বরূপ

হিন্দুসমাজের ভাবী ভরসাস্থল

সুকুমারমতি কুমার ও যুবকগণের করে

এই পুস্তকখানি

সাদরে

অর্পিত হইল

—*—

গ্রন্থকার

ওঁ নমঃ শ্রীনাথায়

ভূমিকা

শ্রীমদ্ গুরুদেবের কৃপায় ব্রহ্মচর্য্য-পালনের নিয়মাবলী প্রকাশ করিলাম। দেশে হিন্দুধর্ম্ম জাগ্রত হইতেছে। ক্রমশঃ লোকে জানিতে পারিতেছে যে, ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমই অন্য তিন আশ্রমের ভিত্তি; সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে অন্য তিন আশ্রম ভিত্তিহীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে—দেশে ধর্ম্মের নামে বিষম অধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সুখের বিষয়, অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। যুবকগণের ব্রহ্মচর্য্য-পালনের জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইতেছে। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য-পালনের কোন ধারাবাহিক নিয়মাবলী না থাকায় অনেকে নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে দুই-একখানি ব্রহ্মচর্য্যের পুস্তক বাহির হইলেও তৎসমুদয় সুকুমারমতি বালকগণের বুঝিবার ও শিখিবার পক্ষে তাদৃশ উপযোগী হয় নাই। আমরা "আর্য্যদর্পণ" মাসিক পত্রিকায় ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। তৎপাঠে গ্রাহক ও পাঠকগণ ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়াই এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। এক্ষণে আর্য্যদর্পণ হইতে একখানি পত্র উদ্ধৃত করিয়া আমরা ভূমিকার বক্তব্য পরিস্ফুট করিতেছি।

মান্যবর

শ্রীযুক্ত কুমার চিদানন্দ

কার্য্যাধ্যক্ষ—"আর্য্যদর্পণ" সমীপেষু—

মহাশয়! আপনাদের শান্তি আশ্রম হইতে প্রকাশিত "আর্য্যদর্পণ" নামক মাসিক পত্রিকা আমাকে কয়েক সংখ্যা পাঠাইয়াছেন, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি।

আপনি পত্রিকায় "ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠে অত্যন্ত সুখী হইলাম। এই কয়েকটী কথা জানিবার জন্য আপনার নিকট এই পত্র লিখিলাম, আশা করি সদুপদেশ দিয়া সুখী করিবেন।

ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি আমার অত্যন্ত অনুরাগ আছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় সময়মত আমি এ বিষয় জানিতে পারি নাই বা ইহার উপকারিতার বিষয়ও বুঝিতে পারি নাই। এতদিনে সব বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু বুঝিলে কি হইবে? যে সর্ব্বনাশ হইবার তাহা হইয়াছে। বীর্য্যধারণ করিব কি, নানাপ্রকার অত্যাচার-অনাচারে বীর্য্যক্ষয় করিয়া এখন পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। যদি পূর্ব্বে কেহ ব্রহ্মচর্য্যের উপকারিতার বিষয় বুঝাইয়া দিয়া তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিত, তবে বাঁচিতাম—এ সর্ব্বনাশ হইত না। এখন উপায় কি?—কি করি? সম্প্রতি একবিংশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছি—কয়েক বৎসর হইল বিবাহও করিয়াছি; এ অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য হয় কি প্রকারে, সেই উপদেশের জন্য আপনার চরণপ্রান্তে উপনীত হইলাম। আশা করি আমার আশা পূর্ণ করিবেন।

হৃদয়ে অনেক আশা ছিল, কিন্তু একটীও পূর্ণ হইতেছে না; জানি না ভগবান্ কবে এই অধমের আশা পূর্ণ করিবেন। প্রায় দুই বৎসর হইল, পূজনীয় নিগমানন্দ স্বামীর "যোগী গুরু" আমার হস্তগত হইয়াছে; "যোগী গুরু" পাঠ করিয়া আমার অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইল, আমি অনেকটা বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম, পরমহংসদেবের কথাই ঠিক—আজকালকার গুরুগিরি ব্যবসাতেই পরিণত হইয়াছে। তিনি কুলগুরু পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং প্রথমে কুলগুরুর নিকট মন্ত্র লইয়া পরে শিক্ষার জন্য উপগুরু করা যায়, তাহাও লিখিয়াছেন। তদনুযায়ী আমি ১৩১৪ সালে পৈতৃক গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বসিয়া আছি। ঈশানচন্দ্র শীল মহাশয়ের নিকট হইতে পরমহংসদেবের ঠিকানা জানিয়া লইয়া তাঁহার শ্রীচরণসমীপে উপস্থিত হইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া বসিয়া আছি; বসিয়া আছি অর্থে যাই যাই করিয়াও যাইতে পারিলাম না—ভগবান্ কবে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন জানি না। আমার পিতা আছেন; পরমহংসদেবের নিকট যাইব, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে। যদি আমি স্বাধীন হইতাম অথবা উপার্জ্জনক্ষম হইতাম, তবে বোধ হয় এতদিনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম। কোথাও যাইতে হইলে বাবার নিকট হইতে খরচ চাহিয়া লইতে হয়, তিনি দিলে যাওয়া হয় নতুবা হয় না; আমি নিজেও উপার্জ্জন করি না যে তাহা দ্বারা পথখরচের সহায়তা হইবে;—অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া আছি, জানি না ভগবান্ অদৃষ্টে কি লিখিয়াছেন! আপনাদের আর্য্যদর্পণ পত্রিকা কয়েক মাস যাবৎ পাইতেছি; গ্রাহক হইবার আন্তরিক ইচ্ছা আছে, কিন্তু কি করিব, এ বিষয়ে বাবার নিকট এক পয়সাও পাই না অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ক কোন পুস্তক বা পত্রিকার জন্য একটি পয়সাও দিতে তিনি রাজী নন।

"যোগী গুরু" পাঠে অবগত হইয়াছি যে বীর্য্যধারণ করিতে না পারিলে কোন বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না। বীর্য্যক্ষয় হইলে ভাব-ভক্তি সমস্ত নাকি বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং সাধন-ভজন বিড়ম্বনা মাত্র। পরমহংসদেব লিখিয়াছেন "সংযম ও অভ্যাসে সমস্ত হয়"—তাহা বুঝি বটে, কিন্তু তথাপিও পারি না, প্রবল সংসার-মায়াবদ্ধ পাশবদ্ধ সামান্য আমি, আমার সাধ্য কি যে অভ্যাস ও সংযমে আমি বীর্য্যধারণ করি? অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, অষ্টাঙ্গ মৈথুন বর্জ্জন করা আমার সাধ্যাতীত। সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিলে পারিব কি-না তাহাও জানি না। সংসার পরিত্যাগ করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলাম, কিন্তু পারি নাই। দেখিলাম সংসারাস্বাদগ্রহণেচ্ছু মন তাহার উন্মত্ত লেলিহান জিহ্বা লক্ লক্ করিয়া বাড়াইয়া দিতেছে। মন বলে—সংসারও ছাড়িব না, ভগবান্‌কেও চাই। 'পয়সাও দিব অল্প, গানও শুনিব ভাল।' এখন কি করি? আমার এ অবস্থায় একজন সদ্‌গুরুর প্রয়োজন—তিনি পথ না দেখাইয়া দিলে আর উপায় নাই। পরমহংসদেবের নিকট যে যাইতে পারিব, তাহার কোন সুযোগ দেখিতেছি না। আর এই হতভাগা তাঁহার নিকট যাইতেও ভয় পায়, কারণ আমার মত পাপীকে যদি তিনি উপেক্ষা করেন! এ পর্য্যন্ত কত পাপ করিয়াছি, তাহার আর ইয়ত্তা নাই; তাই এই পাপকলুষিত হৃদয় লইয়া তাঁহার নিকট যাইতেও ভয় হয়। আর যাওয়ারও উপায় নাই—তিনি অন্তর্য্যামী, তিনি সমস্তই জানিতেছেন। ভয়ে আমি তাঁর নামে চিঠিখানা পর্য্যন্ত দিতে পারিলাম না। আপনি তাঁহার ভক্ত; যদি আপনার কৃপা হয়, তবে তাঁহারও কৃপা হইবে, এই আশায় আপনার চরণসমীপে উপস্থিত হইলাম, অনুগ্রহ করিয়া এ হতভাগার প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিবেন ইহাই প্রার্থনা।

এক্ষণে আমার মনে এই ধারণা হইয়াছে যে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করিলে আর উপায় নাই। ব্রহ্মচর্য্যের বলে মনে একাগ্রতা সাধন সহজ

হইবে, সুতরাং সাধন-ভজনেও ফল পাওয়া যাইবে। নানাবিধ পুস্তকালোচনায় জানিতে পারিয়াছি যে বিবাহিত জীবনেও ব্রহ্মচর্য্য পালন করা যায়। পরমহংসদেবের "যোগী গুরু"তে ইহা উক্ত হইয়াছে এবং "ব্রহ্মচর্য্য-সাধন" নাম দিয়া অন্য পুস্তকে তিনি তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবেন ইহাও লিখিয়াছেন। তিনি 'ব্রহ্মচর্য্য-সাধন' লিখিয়াছেন কি-না জানি না। যদি লিখিয়া থাকেন, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন।

মাঘমাসের "আর্য্যদর্পণ" পাঠে অবগত হইলাম যে, পরমহংসদেবের "জ্ঞানী গুরু" নামক পুস্তক বাহির হইয়াছে। বাবার নিকট টাকা চাহিলে পাইব না জানি, সুতরাং আমার নিকটে যে কয়েকটি টাকা আছে, তাহা দ্বারাই বর্ত্তমানে একখানা "জ্ঞানী গুরু" ও "আর্য্যদর্পণ" পত্রিকার গ্রাহক হইবার ইচ্ছা করিয়াছি। আর্য্যদর্পণের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি; কেবলমাত্র প্রথম সংখ্যা পাই নাই, অতএব আমাকে একখানা 'জ্ঞানী গুরু' এবং প্রথম সংখ্যা 'আর্য্যদর্পণ' একখানা ন্যায্য মূল্যে ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাইয়া দিবেন। আর ঐ পার্শ্বেলের মধ্যেই আমার পত্রের উত্তরে সদুপদেশ দিয়া বাধিত করিবেন। আত্মকাহিনী আপনার চরণে জানাইলাম; এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন। আপনার কৃপা হইলে পরমহংসদেবেরও কৃপা হইবে বলিয়া বিশ্বাস, কারণ ভক্তাধীন ভগবান্। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিফলেই বোধ হয় পরমহংসদেবের সন্ধান পাইয়াছি; কিন্তু পাইলে কি হইবে, এখন পর্য্যন্ত তো শ্রীচরণ-সমীপে উপস্থিত হইতে পারিলাম না। আমার বিশ্বাস, আপনি দয়া করিলেই হইবে। মানব হইয়াও পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি—অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিতেছি—দয়া করুন, অধম পাপী বলিয়া ঘৃণা করিবেন না। এক হিসাবে ভগবানের উপর পাপীদের অধিকার বেশী, কারণ তিনি অধমতারণ পতিত-পাবন। আমার এই অজ্ঞান-অন্ধকার ঘুচাইয়া দিউন—এই প্রার্থনা। পাপীর হৃদয়ে সাহস নাই—ভীত, সঙ্কুচিত সে ভগবানের নিকট সহসা

যাইতে পারে না, ভয় পায়। আমারও তাহাই হইয়াছে।—একে বয়স অল্প, তাহাতে পাপে জর্জ্জরিত—তাই মনে কত ভয় হয়। আপনি দয়া করুন, আমাকে রক্ষা করুন। পরমহংসদেবের নিকট যাইতে আমার সাহস হয় না, আর যাওয়ার উপায়ও দেখিতেছি না। আমার কর্ত্তব্য কি বলিয়া দিউন—আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। সত্বরেই ১ম সংখ্যা "আর্য্যদর্পণ" ও একখানা "জ্ঞানী গুরু" পাঠাইবেন এবং আমাকে কর্ত্তব্যবিষয়ে উপদেশ দিবেন, ইহাই অনুরোধ। ব্রহ্মচর্য্যের কি করিব, তাহাও জানাইবেন ; যাহাতে আর অধোগতি না হয়, তাহাই করিবেন —এই আমার প্রার্থনা। ইতি—

*　　*　　*　　*　　*

পাঠক! নানাবিধ বিচার করিয়া পত্রলেখকের নাম-ধাম প্রকাশ করিতে পারিলাম না, কিন্তু পত্রখানি অবিকল মুদ্রিত হইল। অত্র পত্রিকায় "ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম" শীর্ষক প্রবন্ধ বাহির হওয়ার পর হইতেই এইরূপ কত পত্র প্রত্যহ আমাদিগের নিকট আসিতেছে। নমুনাস্বরূপ একখানি প্রকাশিত হইল। অধিকাংশ পত্রলেখক স্কুল-কলেজের ছাত্র এবং বয়স ১৬ হইতে ২০।২৪ এর মধ্যে।

দেশের উন্নতিকামী মহামান্য নেতাগণ, সমাজসংস্কারকগণ! এখন একবার সমাহিত চিত্তে চিন্তা করুন, দেশের কি শোচনীয় অবস্থা—কি বিষম সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। দেশের অতি দুর্ভাগ্য, তাই অধিকাংশ লোক অন্ধ—দুই একজনের দৃষ্টি এদিকে পতিত হইয়াছে মাত্র। হিন্দুবংশ ধ্বংসপথে চলিয়াছে। এখনও সকলে সাবধান হউন, নতুবা আর রক্ষা নাই। "বিধবা-বিবাহ অভাবে দিন দিন হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হইতেছে" বলিয়া যাঁহারা অভিমত প্রকাশ করেন, আমরা তাঁহাদিগের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। কেননা, সমাজে দেখিতে পাই, এক-একটী রমণী ১৭।১৮টী সন্তান-সন্ততি প্রসব করিয়া থাকেন, কিন্তু কোথাও ২।১টী

মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এইগুলি যথাসম্ভব জীবিত থাকিলে (বিধবা-বিবাহ অপ্রচলন সত্বেও) হিন্দুর সংখ্যা আশাতীত বৃদ্ধি হইতে পারে।

তাই বলি, প্রকৃত পথ ছাড়িয়া বিপথে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিলে কোন লাভ নাই। ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার করিতে না পারিলে দেশের আর মঙ্গল নাই। বীর্য্যহীন পিতার পুত্র শৌর্য্যবীর্য্য হারাইয়া দুর্জ্জয়-রোগগ্রস্ত এবং অকালে কালকবলে পতিত হইতেছে। যাহা হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য অনুশোচনা বৃথা। ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইয়া যুবকগণকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মচর্য্যের উপকারিতা সাধারণকে বুঝাইয়া দিউন। যে শিক্ষায় মানুষকে মনুষ্যত্ব প্রদান করে, তাহার প্রচার লজ্জাজনক বা কুরুচি মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে আর হিন্দুদিগের রক্ষা নাই। আমরা যে আয়ু, বল, স্বাস্থ্য, মেধাশক্তি, ধারণাশক্তি সৎসাহস, উচ্চ আশা—এক কথায় বলিতে গেলে জীবনের যথাসর্ব্বস্ব একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছি, তাহার একমাত্র কারণ ব্রহ্মচর্য্যের অভাব।

যে সকল যুবক ব্রহ্মচর্য্যের উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছে, তাহারাও অভিভাবকের অত্যাচারে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিতে পারিতেছে না। অধিকাংশ পিতা-মাতার ধারণা, পুত্র মৎস্য-মাংস ত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে। অনেক শিক্ষিত পিতা ডাক্তারের অভিমত জানাইয়া বলেন, মৎস্যাদি ভোজন না করিলে চক্ষুরোগ জন্মিবার সম্ভাবনা ; বিশেষতঃ উহাতে বলহানি এবং মস্তিষ্ক বিকৃত হয়। আমরা জিজ্ঞাসা করি, কোন্ বিধবা বঙ্গনারী কিম্বা পশ্চিম ভারতের হিন্দু, মৎস্যবংশ-ধ্বংসকারী বাঙ্গালী যুবকের ন্যায় চশমা ব্যবহার করিয়া থাকেন? শক্তির কথা বোধ হয় প্রত্যেকেই জানেন, একজন পাঞ্জাবী কিম্বা মহারাষ্ট্রীয় যুবক দশজন মৎস্যাহারী বাঙ্গালী যুবকের মোহড়া লইতে পারে। স্বাস্থ্যের কথা—বাঙ্গালীর মত রোগা কে? পুরুষের ধাতুদৌর্ব্বল্য-প্রমেহ আর নারীর বাধক-প্রদর নাই, এমন বাঙ্গালী স্ত্রী-পুরুষ কয়জন আছে জানি না।

সাত্ত্বিক আহারের অশেষ গুণ—পৌরাণিক যুগে তাহার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। আতপ তণ্ডুল ও কাঁচাকলা খাইয়াই জ্ঞানগরিষ্ঠ ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ, ব্যাস, পতঞ্জলি, জৈমিনি প্রভৃতি মহাত্মারা আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোকে ভারতবর্ষ আলোকিত করিয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াই রামানুজ লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের বধসাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন। একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়-হননকারী পরশুরামের অমিতবিক্রম কুমার-ব্রহ্মচারী ভীষ্মের নিকট অবনত হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগের প্রফেসার রামমূর্ত্তির অলৌকিক পরাক্রমের কথা কাহারও অবিদিত নাই। তাহাও ব্রহ্মচর্য্যের ফল। শ্রীযুক্ত তিলক-গোখলের ন্যায় কয়টী বাঙ্গালীর মাথা পরিষ্কার? সুতরাং ঐ সকল কু-যুক্তি দর্শাইয়া ব্রহ্মচর্য্যপালনে অনাদর, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষময় ফল ভিন্ন আর কি বলিব?

উপরোক্ত পত্রে প্রকাশ, পিতা পুত্রগণকে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ বা ধর্ম্মোপদেশ লাভের অবকাশ বা সুযোগ দেন না। তাঁহাদিগের দুর্ব্বল হৃদয়ে সর্ব্বদাই ভয়, সাধুসঙ্গ কিম্বা সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ করতঃ পুত্রটি ধার্ম্মিক হইয়া পাছে অর্থোপার্জ্জনে ঔদাস্য করে। পিতা-মাতারও বড় দোষ নাই—কেননা তাঁহারাও ধর্ম্মরক্ষার্থ শিক্ষালাভ করেন নাই। কাজেই সমাজের অধিকাংশ পিতা হিরণ্যকশিপুর অবতারবিশেষ। আমরা জানি, এই শ্রেণীর একজন জমিদার একমাত্র পুত্রের ধর্ম্মভাব দৃষ্টে পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া একজন বারবনিতার দ্বারা পুত্রকে সুপথে আনিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

পাঠক! হিন্দুসমাজের দুর্দ্দশার আরও বাকী আছে কি? তোমরা যতই সভাসমিতি করিয়া দেশোন্নতির জন্য চীৎকার কর না কেন, প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত কখনই সুফলের আশা করিতে পার না। তাই পদে পদে বিড়ম্বিত হইতেছ। ধর্ম্মই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির একমাত্র ভিত্তি। প্রকৃত শিক্ষায় ধর্ম্মভাব যখন পুষ্ট হইবে, তখনই দেশের যথার্থ উন্নতি আরম্ভ হইবে। ধর্ম্ম ব্যতীত কি কখনও আমিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী নষ্ট হইয়া বিশ্বময়

প্রসারিত হইতে পারে? ধর্ম্ম ব্যতীত কেহ কি কখনও পরার্থে স্বার্থ দলিত করিতে পারে?

তাই বলিতেছি, যতই বক্তৃতার উচ্চরোলে বিশ্ব কম্পিত কর না কেন—নিশ্চয় জানিও "ঘষে-মেজে রূপ আর ধরে-বেঁধে পীরিত" হয় না। প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে হইলে ধর্ম্মবল লাভ করা চাই। ধর্ম্মবল লাভ করিতে হইলেই ব্রহ্মচর্য্যপালন একান্ত আবশ্যক। কেবল পুস্তক পাঠ ও বক্তৃতার দ্বারা ধর্ম্মলাভ করা যায় না। হিন্দু ব্যতীতও পৃথিবীর সর্ব্ব-ধর্ম্মসম্প্রদায়ে প্রত্যক্ষভাবে না হউক পরোক্ষভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালিত হইয়া থাকে। তবে দেশ, কাল, পাত্রভেদে বিভিন্নতা হইতে পারে। আমাদের দেশে বিধবা ললনাগণ আয়ু, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যে বিভূষিতা হইয়া ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা বিঘোষিত করিতেছেন। আর আমরা খেচরের মধ্যে ঘুড়ি, জলচরের মধ্যে কুমীর এবং চতুষ্পদের মধ্যে চৌকী বাদ দিয়া বাকী সমস্ত উদরস্থ করিয়া সমগ্র বাঙ্গালা দেশটাকে ভগবানের হাসপাতালে পরিণত করিতেছি।

অতএব যদি প্রকৃত দেশের উন্নতি ইচ্ছা থাকে, তবে আপামর সাধারণকে ব্রহ্মচর্য্য অভাবে কি ক্ষতি হইতেছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কেবল "ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর" বলিয়া বক্তৃতা দিলে চলিবে না। ধনী মহাশয়েরা ধন, বিদ্বানেরা জ্ঞান এবং সাধারণে অধ্যবসায় লইয়া প্রস্তুত হউন। প্রথমতঃ ছাত্রগণের সৎসাহস এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বিশেষ প্রয়োজন। একদিনেই যে দেশের অভাব দূর হইবে, সে আশা দুরাশা মাত্র। প্রথম উদ্যমে ব্রহ্মচর্য্য সম্যক্ পালন না করিতে পারিলেও যাহাতে যুবকগণ ব্রহ্মচর্য্যের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাদের পুত্রগণের ব্রহ্মচর্য্য-পালনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে পারে, অন্ততঃ সেই সংস্কার লাভ করিতে হইবে। ছাত্রগণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে সুবিধা পায়, প্রতি জেলায়, মহকুমায় এবং বিশিষ্ট পল্লীতে এমন বিদ্যালয় স্থাপিত করিতে

হইবে। দেশের সাধু-মহাত্মারা চেষ্টা করিয়া দু'দশ জন যুবকের ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিবেন। অর্থসাহায্য পাইলে দু'চারিজন কৃতবিদ্য সাধু নিঃস্বার্থভাবে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম খুলিয়া দেশের মহদুপকার সাধন করিতে পারেন।

ভারতবর্ষ হইতে বহুদিন ব্রহ্মচর্য্য উঠিয়া যাওয়ায় হিন্দুসমাজে বহুতর প্রতিকূল অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। সাধু, মহাত্মা, ধনী, জ্ঞানী, কর্ম্মী, ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকগণের সমবেত চেষ্টায় যাহাতে আমাদের সন্তান-সন্ততিগণ সেই ব্রহ্মচর্য্য মহাব্রত অবলম্বন করিয়া শক্তিসম্পন্ন হইতে পারে, ইহা প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষীর জীবনের মহাব্রত হওয়া উচিত। আপন আপন ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া এই মহাব্রত অবলম্বন করিলে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের মোট সমষ্টি হিন্দুজাতির উন্নতি অবধারিত।

আমরা এই আশ্রমে প্রথমতঃ যখন ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ দেই, তখন অনেকে অনেক বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন ব্রহ্মচারী-ছাত্রদের মুখশ্রী ও স্বাস্থ্য দেখিয়া অনেকেই সাগ্রহে ব্রহ্মচর্য্যপালনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। সত্যের মহিমা আলোকের ন্যায় আপনি প্রকাশিত হয়। তবে আমরা সমাজে নগণ্য,—সাধারণকে যে আশ্রমে রাখিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করাই, সে শক্তি আমাদের নাই। তবে যাঁহারা উপদেশ লইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে সাদরে ও সাগ্রহে উপদেশ দিব। এক্ষণে এই পুস্তকপাঠে ব্রহ্মচারী যুবকগণের উপকার হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

শান্তি আশ্রম
অক্ষয়তৃতীয়া, ২০শে বৈশাখ
১৩১৭ বঙ্গাব্দ

বিনীত
শ্রীকুমার চিদানন্দ

ব্রহ্মচর্য্য-সাধন

—০:৪:০—

নিয়ম-পালন

বর্ত্তমান অবস্থা

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাম্ আরোগ্যং মূলমুত্তমম্।

—আয়ুর্ব্বেদ

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে হইলে সর্ব্বতোভাবে শরীর আরোগ্য থাকা অতি প্রয়োজন। শরীর পীড়াগ্রস্ত বা অকর্ম্মণ্য হইলে কোন কার্য্যই সাধন করা যায় না।

আমরা সকলই জানি, সকলই বুঝি; দোষ, গুণ, পর-নিন্দা প্রভৃতির বিচার করিতে জানি; কিন্তু এমন কোন উপায় করিতে পারি না, যদ্দারা দীর্ঘজীবন লাভ করতঃ সংসারের মধ্যে সৎকর্ম্মান্বিত হইয়া মানব-সমাজের কোনও একটী উন্নতি সাধন করিতে পারি। পঠদ্দশায় শিক্ষক-মহাশয় বহু রাজন্যবর্গের জীবনবৃত্তান্ত, এলিজাবেথের ন্যায় রাজ্ঞীগণের চরিত্রবল, কোথায় কোন্ সাগর, মাংসমধ্যে

কতটা যবক্ষারাদি আছে—ইত্যাদি বহু বিষয়ের সমালোচনা দ্বারা আমাদের মনের এতই উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন যে আজ আমরা তুলসীবৃক্ষকে জঙ্গলা-গাছ, বিল্বপত্রকে আগাছা, গাভীকে পশু, পিতামাতাকে কর্ত্তব্যকর্ম্মসংযোজক ইত্যাদি আখ্যা দিয়া বহু বিষয়ের গভীর গবেষণাপূর্ণ সমালোচনা শিক্ষা করিয়াছি। আমাদের অবস্থা এত হীনভাবাপন্ন হইয়াছে যে, আর কোথায়ও মস্তক নুইতে চায় না, সোডাওয়াটার না খাইলে হজম হয় না। গঙ্গাজল বা স্বচ্ছ নদীর জল ঘোলা,—তাহাতে বহুবিধ কীট প্রভৃতি ও কর্দ্দমমিশ্রিত থাকায় তাহা অব্যবহার্য্য।

ইহা আমাদের দোষ নহে, একমাত্র শিক্ষার ফল—কারণ প্রথম হইতে শিক্ষা করিয়াছি "এনালাইজ্" করিতে। যদি বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করিতাম যে **গঙ্গাজলং সেব্যম্ অসেব্যম্ অন্যৎ** অর্থাৎ গঙ্গাজলই পান করিতে হয়, অন্য জল ইহার তুল্য নহে, তুলসীবৃক্ষের রস সর্দ্দিনাশক—শিকড় বীর্য্যবর্দ্ধক, বিল্বপত্রের রস বাতনাশক, কালমেঘের রস প্লীহা-নাশক, পিতামাতা মহাগুরু—এ সকল যদি বুঝিতে পারিতাম, তবে কখনই আমাদের নিকট সোডাওয়াটার, অস্পৃশ্য কুক্কুটাদির মাংস, মিশ্রি সত্ত্বে রিফাইন করা চিনি, ঘৃত সত্ত্বে চিকেনব্রথ অথবা সুগন্ধি পুষ্পরাজি সত্ত্বে বিলাতি ঘাসের এত আদর হইত না। আমরা বিজাতীয় শিক্ষাবলে এতদূর বলশালী হইয়াছি যে, একটু বিদ্যাভিমানী হইলেই ও সমাজে

উচ্চ পদ লাভ করিলেই বান্ধবসমাজে বহুপরিবারপোষক দরিদ্র পিতাকে বাটীর চাকর না বলিলে তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না। আমাদের নজর শিক্ষাবলে এতই উচ্চ হইয়াছে যে, আমাদের ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে, আমাদের শিক্ষা শিক্ষাই নহে, আমাদের সংসারের সার বঙ্গ-ললনাগণ স্ত্রীমধ্যেই গণনীয়া নহেন, আমাদের বঙ্গীয় ঔষধ ঔষধই নহে এবং আমাদের ক্রিয়া-কর্ম্ম ধর্ম্মমধ্যেই গণ্য নহে! কারণ ধর্ম্মরক্ষার্থে আমরা কোন শিক্ষাই পাই নাই।

বর্ত্তমানে মর্ত্ত্যলোকের পিতামাতা মনে করেন যে, পুত্রটী কোন গতিকে (প্রশ্নপত্র চুরি করিয়াও) একবার বি-এ, বি-এল পাশ করিতে পারিলেই তাঁহাদের আর চিন্তা থাকিবে না। কিন্তু ইতিমধ্যে জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন কি—আমার পুত্রটি কত দিন জীবিত থাকিবে, কিম্বা "সারং শ্বশুরমন্দিরং" ভাবিয়া আমাদের অন্নদানে বঞ্চিত করিবে? যদি পুত্রের উপর অর্থ-যশের কামনাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রচলিত বৈদেশিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধর্ম্ম কি, কিরূপে শরীর রক্ষা করিতে হয়, কিরূপে রিপু-সংযম ও চরিত্র-গঠন করিতে হয়, কিসে দেহ বলশালী হয়, কুইনাইনের সঙ্গে তুলনায় গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়ার দোষ-গুণই বা কি, হিন্দুর দেবদেবী কি, হিন্দুধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ কেন, কিরূপে সদ্‌গুণসম্পন্ন হওয়া যায়, কিসে দেশের উন্নতি হয়, দশের উপকার হয়, ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া পিতার কর্ত্তব্য বলিয়া

মনে করি। কারণ বাল্যকাল হইতে যদি শিশুকে সংশিক্ষা না দিয়া বহু রাক্ষসী-বিদ্যার আলোচনা করান হয়, তাহা হইলে উক্ত শিশু যে ভবিষ্যতে রাক্ষসভাবাপন্ন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষকে আমরা জাতীয় বিদ্যালয়সমূহে দুই এক জন ধর্ম্মযাজক নিযুক্ত করিয়া সুকুমারমতি কুমারগণের কোমল হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ বপনের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করি।

সংসারমধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবার ইচ্ছা থাকিলে সর্ব্বাগ্রে দৈহিক উন্নতি আবশ্যক, কারণ জীবনরক্ষা না হইলে সকলই বৃথা। কিন্তু সেই জীবন কিসে রক্ষা করিতে হয়, তাহা অধিকাংশ লোক জানে না, অথবা জানিবার তাদৃশ ইচ্ছাও নাই,—ইহাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আজকালকার যুবকগণ শিক্ষা ও সংসর্গদোষে বৃদ্ধ সাজিয়া গুপ্তভাবে সেনগুপ্ত মহাশয়-দিগের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া পরিশেষে চিত্রগুপ্তের নিকট এজাহার দিতে হাজির হইতেছে। প্রিয় পাঠক মহাশয়! আজ আমাদের ভেকত্ব ঘটিয়াছে। কারণ শাস্ত্র বলিতেছেন যে—

গুণিনি গুণজ্ঞো রমতে নাগুণশীলস্য গুণিনি পরিতোষঃ।
অলিরেতি বনাৎ কমলং নহি ভেকস্ত্বেকবাসোঽপি চ॥

—গুণিগণই একমাত্র গুণিগণের আদর বুঝিয়া থাকেন। যেমন পদ্ম যে কি পদার্থ, তাহা ভ্রমরই যথার্থ বুঝে—ভেক পদ্মের নিকট বাস করিয়াও তাহার গুণপনা বুঝিতে পারে না।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে যে অমূল্য হীরকখণ্ড সজ্জিত রহিয়াছে, আমরা কাচভ্রমে তাহা দূরে নিক্ষেপ করিতেছি। যদি আমরা জহুরী হইতাম, তাহা হইলে কখনই আমাদের এত দুর্দ্দশা হইত না, আমরা সর্ব্বদাই সুখে কালযাপন করিতে পারিতাম। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, সংসারে জ্ঞানী হইতে পারিলেই সমুদয় অসংকর্ম্ম নষ্ট হইতে পারে ; যথা—

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

—গীতা ৪।৩৮

যদি জ্ঞানই একমাত্র উন্নতির সাধক হয়, তবে সেই জ্ঞান কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অনুসন্ধান করা বিজ্ঞগণের একান্ত কর্ত্তব্য। একে আমরা অধিকাংশই অন্ধ, তাহাতে সদ্গুরুর অভাব ; যাঁহারা উপদেশ দিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে আবার অধিকাংশ আমাদের হইতেও অন্ধ ; সুতরাং আমাদের যে এত দুর্দ্দশা ঘটিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? বিশ্বাস করি কার কথায়? যিনি বলিতেছেন—গৃহস্থ জাগরিত হও, আবার তিনিই বলিতেছেন—উঠিও না, রাত্রি আছে।

এখন কি করা কর্ত্তব্য? এখন কর্ত্তব্য এই যে, আমাদের ঈশ্বরদত্ত যে মনুষ্যত্ব তাহাকেই আশ্রয় করা। ঈশ্বর আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রত্যেককেই জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন ; সুতরাং একটু স্থিরভাবে সেই জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারিলে, সর্ব্বদা

সামাল সামাল করিয়া গোটা মানবজীবনটাকে পয়মাল করিতে হইবে না। আমাদের দেহ-রথে বিবেক-শ্রীকৃষ্ণ সারথিরূপে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিনাম্নী অশ্বিনীদ্বয়ের বল্গা ধারণপূর্ব্বক বিষাদমগ্ন শিষ্য ও সখা অর্জ্জুনরূপী মনকে নিয়তই গীতামৃত পান করাইতেছেন। অতএব, বিবেকের শরণাগত হইয়া জ্ঞান লাভ করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

জ্ঞান জন্মাইবার প্রধান হেতু, মনকে সংশয়শূন্য করা; কারণ মনে সংশয় থাকিলে বিশ্বাস জন্মে না, আর বিশ্বাস না জন্মিলে প্রকৃত জ্ঞানোপলব্ধিও হয় না। ইহার উদাহরণস্থল ঈশ্বরের অস্তিত্ব ; ইহা কেহ দেখে নাই, বিশ্বাসই একমাত্র ইহার হেতু। তাহাতেই বলা যায়, অগ্রে সংশয়শূন্য হও ; সংশয়শূন্য হইতে হইলে অগ্রে দৃষ্টকর্ম্মতাই প্রধান, তাহার পর সন্দেহ নাশ। সন্দেহ নষ্ট হইলে বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। প্রত্যেক দেহীর যেমন আহার-বিহারাদি নিত্য আবশ্যক, সেইরূপ প্রত্যহ জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য যত্ন আবশ্যক। কেননা কেবল পশুর মত নিত্য-ভোজনশীল হইলে আমাদের মানব নামের যে একটা প্রধান স্বত্ব আছে, তাহা যে সততই লোপ পাইবে, তাহাতে আর কি সন্দেহ আছে ? যেমন শরীর রক্ষা করিতে হইলে নিত্য নিত্য উত্তম খাদ্য ও পরিশ্রমের আবশ্যক, সেইরূপ জ্ঞানী হইতে ইচ্ছা করিলে ভগবন্নির্দ্দিষ্ট নিয়মগুলিও সর্ব্বদা পালনীয়—কেননা মত্তমাতঙ্গসদৃশ দুর্দ্দম মনকে ধৈর্য্যরজ্জুতে বন্ধন

করিতে না পারিলে কখনই সফলকাম হওয়া যায় না। মনের সংশয় যতই বৃদ্ধি করা যায়, মন ততই উত্তেজিত হয়। সেই জন্য অগ্রে নম্রভাব, পরে সদ্‌গুরু-অন্বেষণ, পশ্চাৎ উপদেশ-গ্রহণ, তৎপরে উপদেশ পালন এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মের সংযোজনাদি করা ;—ইহা করিলে বিশ্বাস আপনা হইতেই আসিয়া থাকে। আমরা উপযুক্ত গুরুর অভাবে উপযুক্ত শিক্ষালাভে বঞ্চিত বলিয়া অসীম জ্ঞানসম্পন্ন আর্য্য-বংশে জন্মিয়াও অকর্ম্মণ্য, নগণ্য হইয়াছি এবং সর্ব্বদাই রোগে, শোকে, সঙ্কল্পিত কর্ম্মনাশে হা-হুতাশ করিয়া মরিতেছি।

প্রাচীন ভারতে শিবতুল্য ঋষিগণের অসাধারণ শক্তির কথা বোধ হয় আজকাল জগদম্বার কৃপায় সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু তাঁহাদের এইরূপ অসাধারণ শক্তির মূল কারণ কি, তাহা অবহিতচিত্তে কেহ চিন্তা করিয়াছেন কি ? **ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্যই** (বীর্য্যধারণই) তাঁহাদের শক্তির একমাত্র কারণ।

অনেক শতাব্দী গত হইল, ভারতবাসীর এই শক্তির মূলে কুঠারাঘাত পড়িয়াছে। আজকাল ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া একটা কথাই নাই। পুরুষানুক্রমে এই সর্ব্বরোগ-প্রতিষেধক, সর্ব্বদুঃখ-বিনাশক এবং ভারতের প্রাচীন উন্নতির ও পুনরুত্থানের একমাত্র বীজমন্ত্র—এই **ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্যব্রত** হারাইয়া ভারতবাসিগণ আজকাল সকল অধিকারচ্যুত হইয়া কতগুলি দুরারোগ্য রোগের অধিকারী হইয়াছে এবং ক্রমেই ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে। পিতামহের যে শক্তি ছিল, পিতার সে

শক্তি নাই, ক্ষয় হইয়াছে। আবার সন্তানগণও ইচ্ছায়ই হউক, বা অনিচ্ছায়ই হউক, শিক্ষার দোষেই হউক বা দীক্ষার দোষেই হউক, অনাচারে-কদাচারেই হউক বা অনাহারে-কদাহারেই হউক, রোগেই হউক বা অত্যাচারেই হউক, যে সামান্য শক্তিটুকু পিতামাতা হইতে পাইয়াছে, তাহাও সর্ব্বদা ক্ষয় করিতে বাধ্য হইতেছে বা ইচ্ছা করিয়া ক্ষয় করিতেছে—কেহ বাধা দিতে সাহসী হইতেছেন না বা বাধা দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছেন না।

আজকাল প্রায় বার আনা লোকই ক্ষয়রোগগ্রস্ত অর্থাৎ যক্ষ্মারোগগ্রস্ত, এরূপ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। কারণ সকলেরই শরীর ক্রমে ক্ষয় হইতেছে, এবং যে কোন কারণেই হউক, শরীর ক্ষয় হইলে তাহাকে ক্ষয়রোগ বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ ও ডাক্তারী মতে ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। ক্ষয়ের কোন না কোন লক্ষণ আজকাল প্রায় সকল মানুষেই দৃষ্ট হয়। প্রায় অনেকেরই শরীর শীর্ণ, লাবণ্যশূন্য, মন স্ফূর্ত্তি-বিহীন, দৃষ্টি ক্ষীণ, কেশ পক্ব—শুক্রগত দোষ না আছে এমন লোক অতি বিরল। চিন্তাশক্তি, ধারণাশক্তি আজকাল প্রায় অনেকেরই নাই। মস্তিষ্কের চালনা করিয়া যে একটী নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিবে, এমন শক্তি কাহারও নাই; প্রায় সকলেই অনুকরণপ্রিয়, "যে বলে রাম, তার সঙ্গেই যাম"-গোছের—সৎসাহস কাহাকে বলে জানে না। এই ত গেল একাদশ ইন্দ্রিয়ের প্রধান ইন্দ্রিয় মনের কথা। তৎপর অন্যান্য

দশেন্দ্রিয়েরও শক্তি অনেক কম হইয়া গিয়াছে। ইউনিভার্সিটী হইতে আজকালকার জীবগণ প্রায় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ইত্যাদি শূন্য হইয়া বাহির হইতেছে। এমন কি আজকালকার লোক মৃত্যুকালে মৃত্যুর সকলগুলি লক্ষণ প্রকাশিত না হইতেই মরিয়া যায়।

আজকালই এমন ধারা, দুই তিন পুরুষ পরে যে কি হইবে, তাহা অনুমান করিতে কাহারও বাকী আছে কি? তাই বলিতেছি, ভারতবাসিগণ ক্রমেই ধ্বংসের পথে চলিতেছে—বাধা দেয় কে? যদি কেহ স্বদেশহিতৈষী থাকেন, তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য, এই ক্ষয়রোগ হইতে ভারতবাসীকে রক্ষা করা।

আজকাল ভারতের কল্যাণার্থ ও সংস্কারের জন্য সমাজে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত। সমস্ত ভারতবাসী ভগবানের কৃপায় ও ঐশীশক্তিতে এখন জাগ্রত। এই শুভমুহূর্ত্তে যাহাতে স্থায়ী ফল হইতে পারে, এমন উদ্যোগ করা প্রত্যেক স্বদেশ-হিতৈষীরই কর্ত্তব্য। এ পর্য্যন্ত অনেক কথাবার্ত্তা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃত কার্য্য এখনও আরম্ভ করা হয় নাই। পাশ্চাত্য-শিক্ষাভিমানী সংস্কারক ও উন্নতিপ্রিয় সভ্যগণ ভারতের পুনরুত্থানের ও সংস্কারের মূলমন্ত্র বিস্মৃত না হন, বৃক্ষের মূল নষ্ট করিয়া অগ্রভাগে জল না ঢালেন, এই প্রার্থনা। প্রাচীন ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের মতে জীবের জন্ম-সংস্কারই প্রধান সংস্কার। লোক ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া গার্হস্থ্যাবলম্বী হইলে তাহাদের সন্তানসন্ততিগণ

নিশ্চয়ই হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ, সংসাহসী, দীর্ঘজীবী ও ধার্ম্মিক হইবে। তাহা হইলে সামাজিক উন্নতি, জাতীয় উন্নতি, ধর্ম্মনীতির উন্নতি, সকল উন্নতিই আপনা-আপনি হইবে। এইরূপ মেধাবী, ধৈর্য্যবীর্য্যশালী ও সুসংস্কারসম্পন্ন জীবগণ নিশ্চয় কর্ম্মবীর হইবে এবং তাহারা এই কর্ম্মভূমি ভারতে ছাই ধরিলে সোনা হইবে; কিন্তু আজকাল আমরা সোনা ধরিতেছি, ছাই হইতেছে। এইরূপ হইলে ক্রমে এই ভারত হইতে তমোগুণ পলায়ন করিবে এবং সত্ত্ব ও রজোভাবের আবির্ভাব হইবে; সোনার ভারত আবার সোনার ভারত হইবে—আর শ্মশানভূমি থাকিবে না।

তাই বলিতেছি, ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালনই সর্ব্ব-রোগপ্রতিষেধক, সর্ব্বদুঃখবিনাশক এবং ভারতের পুনরুত্থানের একমাত্র বীজমন্ত্র। আসুন অভিভাবকগণ, শিক্ষকগণ, ছাত্রগণ, সকলেই একবাক্য হইয়া আবার সেই মহাশক্তির আবির্ভাবের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি—দেখা যাউক, কোন সুফল ফলে কি না! "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ?"

ছেলে ভাল হউক, এইটি আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। কারণ পিতা পুত্রের জন্য যে সম্পত্তি রাখিয়া যান, তন্মধ্যে সর্ব্ব-প্রকার সম্পত্তির মধ্যে বিদ্যা এবং সংস্বভাবই প্রধান। এই দুইটির অভাব হইলে যতই পৈতৃক সম্পত্তি থাকুক না কেন, তাহা রক্ষা হওয়া দুষ্কর। কিন্তু পিতামাতার এইটি আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহারা ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহেন।

জন্ম হইতে ৭।৮ বৎসর পর্য্যন্ত আমরা ছেলেকে সর্ব্বদা কাছে-কাছে রাখি এবং তাহার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখি। কিন্তু দশম কি দ্বাদশ বৎসর পরে তাহাদের উপর আমাদের আর কোন দৃষ্টি থাকে না এবং দৃষ্টি রাখাও নিষ্প্রয়োজন মনে করি—আমাদের রুচিবিকারের জন্য একপ্রকার "যমলজ্জা" আসিয়া উপস্থিত হয়। এই যমলজ্জাই আমাদের জাতীয় অধঃপতনের মূল। যতদিন না আমরা এই যমলজ্জা ত্যাগ করিয়া পুত্রগণকে শৈশবাবস্থায় যেরূপ স্নেহ ও যত্ন করিতাম এবং সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখিয়া তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতাম—সেইরূপ না করিব, ততদিন আমরা আমাদের পুত্রপৌত্রাদির জন্য যত্ন করি, তাহাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করি, এরূপ বলা কেবল কথার কথা।

যদি জাতীয় উন্নতির জন্য বাস্তবিক আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তবে রাজনৈতিক ব্যাপারে ও সভাসমিতিতে বিশেষ মনোযোগ না দিয়া আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে নিজ নিজ ছেলেদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করিতে সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করা, যাহাতে ছেলেগুলি কুসংসর্গে না মিশিতে পারে, যাহাতে ধর্ম্মপথে মন রাখিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধন করিতে তৎপর হয়, সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা। স্কুলে পাঠাইলেই তাহাদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পন্ন হইল, এরূপ মনে করা উচিত নহে। জাতীয় উন্নতি বা অবনতির মূলই ছাত্রগণ; তাহারা যেরূপভাবে গঠিত হইবে, জাতীয় উন্নতি

ও অবনতি ঠিক সেইরূপ হইবে। অতএব ছাত্রগণের যাহাতে শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়, সেই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিরই প্রধান কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে লজ্জা করিলে চলিবে কেন? বৃক্ষের মূলে আঘাত করিয়া অগ্রভাগে জলসেচন করিলে চলিবে কেন?

নিজের শক্তি নিজে হারাইয়া আবার শক্তির জন্য বিজেতা ও বিজাতীয় রাজার নিকট কাঁদিলে তাঁহারা হাসিবেন মাত্র, শক্তি দিবেন কেন? শক্তি দিলেই বা তাহা রাখিতে পারিব কেন? আমরা যে মেধাশক্তি, ধারণাশক্তি, প্রতিভা, সৎসাহস, উচ্চ আশা—এক কথায় বলিতে গেলে আমাদের জীবনের যথাসর্ব্বস্ব **ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য** ব্রত প্রতিপালন না করাতে একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছি। এখন আবার শক্তির জন্য পরের কাছে কাঁদিলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে মাত্র, কোনও ফলোদয় হইবে কি?

আজকালকার প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য-বিদ্যাভিমানিগণের মধ্যে দুই একজন মহৎলোক ব্যতীত কেহ মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে বা দুই-একখানা মূলগ্রন্থ প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইতেছেন না; থাকুক মূলগ্রন্থ প্রণয়ন করা বা মৌলিক তত্ত্ব নিরূপণ করা, আর্য্যঋষি-প্রণীত তত্ত্বগুলি বুঝিবার শক্তিও অনেকেরই নাই। এক কথায় বলিতে গেলে প্রকৃত জ্ঞান উপার্জ্জন আজকাল আমাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কি সেই মুনিঋষিদের বংশধরগণের

পরিচয়? তাঁহারা বেদ, বেদান্ত, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহাদের জীবনের ব্রতই ছিল পরোপকার। আর তাঁহাদের বংশধর আমরা প্রকৃতপক্ষে এতই দুর্ব্বল ও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি যে, ঐরূপ কিছু করা ত দূরের কথা, সামান্য ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাগুলি পাশ করা ও সামান্য জীবিকা উপার্জ্জন করা ব্যতীত আমাদের দ্বারা পৃথিবীর আর কোন কার্য্যই সাধিত হইতেছে না। সেই মহাত্মাদিগের বীর্য্য ও রক্ত এখনও আমাদের ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত প্রতিপালন না করাতে আজ শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি। যাহাতে আমাদের সন্তান-সন্ততিগণ সেই ব্রহ্মচর্য্য-মহাব্রত অবলম্বন করিয়া শক্তিসম্পন্ন হইতে পারে, আমাদের সর্ব্বপ্রযত্নে সেই চেষ্টা করাই জীবনের মহাব্রত হওয়া উচিত।

আমাদের কথা—"গতস্য শোচনা নাস্তি"। কিন্তু যাহাদের এখনও সময় আছে, তাহাদের উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিলে প্রত্যেক অভিভাবকের নিজের স্বার্থ ও সর্ব্বসাধারণের স্বার্থ উভয়ই রক্ষিত হইবে অর্থাৎ প্রত্যেক পরিবারও সুখী হইবে এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের মোট সমষ্টি হিন্দুজাতিরও উন্নতি অবধারিত।

"ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর"—কেবল এই কথা বলিলেই চলিবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ছাত্র, অভিভাবক ও শিক্ষক

সকলেরই সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। প্রথমতঃ ছাত্রগণের বিশেষ সৎসাহস এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন। ভগবানের নিকট সরল প্রার্থনা এবং সৎসংসর্গ এ বিষয়ে প্রধান সহায়। এখনও ভাল এবং মন্দলোক সর্ব্বত্রই আছে, বাছিয়া লইতে পারিলেই হয়। আহার-সম্বন্ধেও সংযম দরকার। তৎপরে ছাত্রগণ ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে সুবিধা পায়, এমন বিদ্যালয় স্থাপিত করিতে হইবে। কেবল সৎসংসর্গ, আহারের সংযম ইত্যাদি হইলেই যথেষ্ট হইবে না। পুরুষানুক্রমে ব্রহ্মচর্য্য হারাইয়া ভারতবাসিগণ জন্ম হইতেই শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। পিতামহ ও পিতার দুর্ব্বলতা ক্রমে সন্তানে আসিয়া বর্ত্তিয়াছে। অতএব তাহারা জন্ম হইতেই যে দুর্ব্বলতা ও তদানুষঙ্গিক কতকগুলি রোগকে চিরসহচর করিয়া লইয়াছে, তাহা হাজার চেষ্টাতেও দূরীভূত হইবে না। তজ্জন্য **ব্রহ্মচর্য্য** কি, তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া উপায় অবধারণ করিতে হইবে।

ব্রহ্মচর্য্য কি ?

বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্।

—পাতঞ্জল দর্শন

বীর্য্যধারণের নাম ব্রহ্মচর্য্য। শরীরস্থ শুক্রধাতুকে অবিচলিত ও অবিকৃত রাখিবার উপায়কে ব্রহ্মচর্য্য বলে। শুক্রই শরীররক্ষার মূল নিদান। আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রেও এই কথার বিশেষ উল্লেখ আছে। যথা—

রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জায়াঃ শুক্রসম্ভবঃ॥
শুক্রং সৌম্যং সিতং স্নিগ্ধং বলপুষ্টিকরং স্মৃতম্।
গর্ভবীজং বপুঃসারো জীবস্যাশ্রয় উত্তমঃ॥
ওজস্তু তেজো ধাতূনাং শুক্রান্তানাং পরং স্মৃতম্।
হৃদয়স্থমপি ব্যাপি দেহস্থিতিনিবন্ধনম্॥

—সুশ্রুতঃ

—রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়। শুক্র সৌম্য, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ এবং বল-পুষ্টিকারক, উহা গর্ভের বীজস্বরূপ, শরীরের সার এবং জীবের জীবনের প্রধান আশ্রয়। রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত সপ্তধাতুর তেজকে **ওজঃ** বলে। হৃদয় ইহার প্রধান আধার হইলেও ইহা সর্ব্বশরীরব্যাপী এবং শরীররক্ষার প্রধান সাধন।

শুক্র নষ্ট হইলে ওজঃ ধাতু বিনষ্ট হইয়া থাকে, কারণ শুক্রই ওজঃস্বরূপ অষ্টম ধাতুর আশ্রয়স্থল। ওজঃপদার্থ ব্রহ্ম-তেজ বলিয়া প্রখ্যাত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই ওজঃপদার্থকে হিউম্যান ম্যাগ্নিটিজিম্ (*Human magnetism*) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মতেও ইহা দেহরক্ষার একমাত্র উপাদান। ইহার অভাব হইলে মানুষের সৌন্দর্য্য দৈহিক বল, ইন্দ্রিয়গণের স্ফূর্ত্তি, বুদ্ধি, স্মরণশক্তি, ধারণাশক্তি প্রভৃতি সমস্তই নষ্ট হইয়া যায় এবং সেই দেহ যক্ষ্মা, প্রমেহ,

শক্তিরাহিত্য প্রভৃতি বহুবিধ রোগের নিলয় হইয়া পড়ে এবং সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে উদাসীন ও জড়ের ন্যায় হইয়া অল্পকালের মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য শরীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণও এ কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার ফ্যাল্‌রেট্ লিখিয়াছেন—*Debility of intellect and especially of the memory characterises the mental alienation of the licentious.* অতএব যে কোন কর্ম্ম করিতে লইলে দেহরক্ষার প্রয়োজন—দেহরক্ষা করিতে হইলে বীর্য্যরক্ষা বা ব্রহ্মচর্য্য-সাধনের বিশেষ প্রয়োজন।

পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ আপন আপন পুত্রগণকে নবম বৎসরে উপনীত ও ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্মাবলম্বী করিয়া গুরুসকাশে অধ্যয়নের জন্য প্রেরণ করিতেন। ব্রহ্মচর্য্য-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তবে তাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ ও দারপরিগ্রহ করিতেন। যে ব্যক্তির বীর্য্য একবার দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত হইয়া গিয়াছে, তাহার আর ভাবনা কি? কেবল পুত্রোৎপাদনজন্য যে সামান্য ব্যয়, তাহাও ইচ্ছাধীন।

কিন্তু সে দিন গিয়াছে। এখন কু-শিক্ষায়, কু-আচরণে বিদ্যালয়ের বালক পর্য্যন্ত শুক্রব্যয়ী। বালক হইতে প্রৌঢ় পর্য্যন্ত সকলেই ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য বৈধ এবং অবৈধ উপায়ে শুক্রক্ষয় করিয়া জীবনের সুখ নষ্ট করিয়া বজ্রদগ্ধ তরুর ন্যায় বিচরণ করিতেছে এবং তাহাদের উৎপাদিত সন্তানগণ আরও

রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে।

ন তপস্তপ ইত্যাহুর্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্ যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ॥

ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ বীর্য্যধারণই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা। যিনি এই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ঊর্দ্ধরেতা হইয়াছেন, তিনিই মনুষ্যনামে প্রকৃত দেবতা। যিনি ঊর্দ্ধরেতা, মৃত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন—বীরত্ব তাঁহার করায়ত্ত। ইচ্ছা করিলে তিনি অদ্ভুত সাধন করিতে পারেন। শুক্রের ঊর্দ্ধগমনে তিনি অতুলানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। এই জন্য ভীষ্ম, পরশুরাম জগজ্জয়ী বীর ছিলেন, এই জন্য মহাশক্তিশালী ইন্দ্রজিৎকে সংহার করিবার জন্য রামানুজ লক্ষ্মণকে চতুর্দ্দশ বৎসর ব্যাপিয়া বীর্য্যধারণ করিতে হইয়াছিল।

শ্রবণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ॥
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥

কামপ্রবৃত্তিসহকারে রতিবিষয়ক কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, কেলি, দর্শন, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, তদ্বিষয়ে অধ্যবসায় এবং ক্রিয়ানিষ্পত্তি—মৈথুনের এই অষ্ট অঙ্গ ; ইহার বিপরীত কর্ম্মকে **ব্রহ্মচর্য্য** বলে।

এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্য-সাধনার উপদেশ এই যে, বিপরীত বৃত্তির উত্থাপনক্রমে এই সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করিতে হয়।

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।

—পাতঞ্জল দর্শন

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠা হইলে বীর্য্যলাভ হয়। বীর্য্য সঞ্চিত হইলে মস্তিষ্কে প্রবল শক্তি সঞ্চারিত হয়। এই মহতী ইচ্ছাশক্তির বলে মনের একাগ্রতা-সাধন সহজ হয়। ব্রহ্মচর্য্যের বলে নরদেহে ব্রহ্মণ্য ও নারীদেহে সতীত্বের বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

পাঠক! এতাবতা যতদূর আলোচিত হইল, তাহাতে ব্রহ্মচর্য্য কি এবং ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের অভাবে হিন্দুদিগের এবং হিন্দুর দেশের কি দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন।

পূর্ব্বে হিন্দুসমাজস্থ মনুষ্য-জীবনের চারিটী বিভাগ ছিল। **১ম—ব্রহ্মচর্য্য, ২য়—গার্হস্থ্য, ৩য় বানপ্রস্থ এবং ৪র্থ—সন্ন্যাস।** কিন্তু বর্ত্তমানে এক ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের অভাবে অন্যগুলি অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। মূল ছেদন করিলে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ফল-মূলের যেরূপ অবস্থা হয়, হিন্দুসমাজের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমই সকল আশ্রমের ভিত্তি। তাই গৃহস্থাশ্রম বলিলে এক্ষণে ভোজনালয় ও শয়নালয় ভিন্ন কোন পবিত্র ভাবের কথা মনে পড়ে না। যদি মনুষ্যজীবনের যথার্থ সদ্ব্যবহার করিতে চাও, যদি প্রকৃত শারীরিক, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে চাও, তবে পুত্র-পৌত্রগণকে বাল্যকালে ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন

করাও। কিরূপ নিয়ম-সংযমে থাকিলে ব্রহ্মচর্য্য সাধিত হয়, আমরা ক্রমশঃ তাহা বিবৃত করিতেছি। শারীরিক ও মানসিক এই দ্বিবিধ সংযমে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম গঠিত। অগ্রে শারীরিক অর্থাৎ বাহ্যিক নিয়ম-সংযমের পদ্ধতি আলোচনা করা যাউক।

প্রাতঃকৃত্য

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই **শয্যা ত্যাগ করিবে** এবং শীতল জলদ্বারা চক্ষুদ্বয় উত্তমরূপে ধৌত করিবে। মলমূত্রাদি ত্যাগের পর জলশৌচ করিয়া মৃত্তিকা ও জল দ্বারা হস্ত পরিষ্কার করিবে। যে বস্ত্র পরিধান করিয়া মলত্যাগ করিবে তাহা ছাড়িয়া ফেলিবে। নতুবা গামছা পরিয়া পায়খানায় যাইবে। পরে হস্তপদাদি ধৌত করিবে। প্রস্রাবের পরেও জলশৌচ করা কর্ত্তব্য; এ বিষয়ে আলস্য করিবে না। **শৌচ সম্বন্ধে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের রীতি অনুকরণীয় জানিবে।** এইরূপে বাহ্য শৌচ অবলম্বন করিলে ক্রমে চিত্ত পবিত্র হইবে।

দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার না করিয়া দন্তমঞ্জন দ্বারাই দন্ত পরিষ্কার করিবে। ফুলখড়িচূর্ণ এক ছটাক, সুপারীচূর্ণ* এক ছটাক, লবণ এক ছটাক, ফিটকিরিচূর্ণ অর্দ্ধ ছটাক, শুঁট ও মরিচচূর্ণ অর্দ্ধ ছটাক এবং কর্পূর দশ রতি, এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে

* সুপারী কড়ায় ঈষৎ ভাজিয়া লইবে, পোড়াইবে না।

উত্তমরূপে পেষণ ও মিশ্রিত করিয়া লইলেই উৎকৃষ্ট দন্তমঞ্জন প্রস্তুত হয়। ইহা বাজারের দন্তমঞ্জন অপেক্ষা স্বাস্থ্য ও ধন-রক্ষাকারী। ইহা দন্তের অত্যন্ত হিতকর এবং মুখের ক্লেদ ও দুর্গন্ধনাশক। এতদ্দ্বারা **প্রত্যহ দন্ত পরিষ্কার করিবে।** জিবছোলা দ্বারা জিহ্বার ক্লেদ পরিষ্কার করিতে ভুলিবে না।

স্নানবিধি

প্রত্যহ বেলা এক প্রহরের মধ্যে অর্থাৎ বেলা নয়টার মধ্যেই স্নান করা অত্যন্ত হিতকর জানিবে। **তৈলমর্দ্দন কর্ত্তব্য নহে**; কিন্তু যাহাদের অভ্যাস আছে, তাহাদের অগ্রে সর্ব্বশরীরে খাঁটি সর্ষপ তৈল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া স্নান করিতে হইবে। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখে, নাসিকা, কর্ণ ও নাভিকুণ্ডের মধ্যেও তৈল দিবে। যদি সর্দ্দি অর্থাৎ শ্লেষ্মাধিক্য না থাকে এবং শরীর ভারবোধ না হয়, তবে শীতল জলে অবগাহন স্নানই প্রশস্ত। কিন্তু শীতকালে যাহা শরীরের পক্ষে সুখস্পর্শ, এরূপ ঈষদুষ্ণ জলদ্বারা স্নান করিবে। স্নানের সময় গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা সর্ব্বশরীর উত্তমরূপে মার্জ্জন করিবে, পরে আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ করিয়া পরিষ্কৃত শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিবে। পট্টবস্ত্র অর্থাৎ রেশমী কাপড় প্রশস্ত জানিবে, তদভাবে শুক্ল কার্পাসবস্ত্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। **প্রত্যহ প্রাতে মধ্যাহ্ণে এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্নান করা বিধেয়।**

একবার মাত্র অভ্যঙ্গ স্নান অর্থাৎ সর্ব্বশরীরে তৈলমর্দ্দন স্নান করা বিহিত। যদি জ্বর ও সর্দ্দি থাকে, তবে অবগাহন স্নান না করিয়া উষ্ণ জল দ্বারা গাত্র পরিষ্কার করিবে। পরে এক প্রহর অর্থাৎ তিন ঘণ্টা অন্তর এক-একবার সর্ব্বশরীর ভিজা গামছা দ্বারা মাজিয়া পুনরায় শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া ফেলিবে। বেলা ১২টা, ৩টা, ৬টা এবং রাত্রি ৯টার সময় এইরূপে প্রত্যহ গাত্র পরিষ্কার করা একান্ত কর্ত্তব্য।

হোমবিধি

হোমের জন্য স্নানের পূর্ব্বেই একশত আটটী (১০৮) বিল্বপত্র সংগ্রহ করিবে। গ্রামান্তর হইতে অর্থাৎ স্বীয় বাসভবন হইতে অন্যূন অর্দ্ধক্রোশ অন্তরস্থ স্থান হইতে বিল্বপত্র সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক থাকিলে স্বগ্রাম বা স্বভবনস্থ বৃক্ষ হইতেই বিল্বপত্র চয়ন করিবে। এই বিল্বপত্রগুলি স্বয়ং সংগ্রহ করিবে; অন্যকে স্পর্শ করিতে দিবে না। বিল্বপত্রগুলিতে জীবন্ত কীট (পিপীলিকা, মাকড়সা প্রভৃতি) না থাকে; অর্থাৎ উহাদিগকে পরিষ্কার করিয়া লইবে।

হোমের জন্য একখানি স্বতন্ত্র গৃহ অর্থাৎ যে গৃহে অন্যের যাতায়াতের প্রয়োজন নাই, এরূপ গৃহ হইলেই ভাল হয়। কিন্তু স্বয়ং সেই গৃহে রাত্রিকালে শয়ন করিবে। হোমের জন্য

কাষ্ঠ (যে কোন কাষ্ঠ), একশত আটটী বিল্বপত্র, গব্য ঘৃত (অভাবে মহিষ-ঘৃত), ধূপ-ধুনা, ঘৃত-প্রদীপ, চন্দন (শ্বেত বা রক্ত) এবং কুশাসন (অথবা অনুরূপ আসন) আবশ্যক।

স্নানের পর বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া শরীরে চন্দন লেপন করিবে এবং বিল্বপত্রগুলিও ঘৃতসিক্ত করিয়া লইবে। পরে শয়নগৃহে ঘৃত-প্রদীপ ও ধূপ-ধুনা জ্বালাইয়া কাষ্ঠগুলি চতুরস্রভাবে সজ্জিত করিয়া তাহাও জ্বালাইবে। অনন্তর কুশাসন বা অন্যবিধ পবিত্র আসনে উপবেশন করিয়া চিত্ত স্থির করতঃ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এইরূপ চিন্তা করিবে—

"এই গৃহ হইতে প্রেত, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষসাদি অনিষ্টকর দেবযোনি-সকল পলায়ন করিয়াছে; এক্ষণে আমার এই ক্ষুদ্র কুটির মহাত্মা দেবগণ কর্তৃক পূর্ণ হইয়াছে। এখানে ইন্দ্রাদি দেবগণ উপস্থিত হইয়াছেন। আমার এই কুটিরে বিষ্ণুলোক, ব্রহ্মলোক ও শিবলোক হইতেও দেবগণ আবির্ভূত হইয়াছেন। আহা অদ্য আমার কি সৌভাগ্য উপস্থিত!"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই দেখিবে শরীর রোমাঞ্চিত, প্রাণ পুলকিত এবং ভক্তিভরে কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইবে।*

* যদি এইরূপ রোমাঞ্চ ও আনন্দ না জন্মে এবং ভক্তির উদয় না হয়, তবে জানিবে, হোমগৃহে কোন অপবিত্র বস্তু আছে, অথবা তোমার শৌচ সম্বন্ধে কোন প্রকার গুরুতর দোষ ঘটিয়াছে; তাহা হইলে তৎ-প্রতিকারে তৎক্ষণাৎ যত্নবান্ হইবে।

তখন উপস্থিত দেবগণের নিকট তোমার আন্তরিক প্রার্থনা জানাইবে এবং মন্ত্রজপপূর্ব্বক অগ্নিতে ঘৃতসিক্ত বিল্বপত্র এক-একটি করিয়া প্রক্ষেপ করিবে।* বিল্বপত্রগুলি নিঃশেষিত হইলে দেবগণের নিকট পুনঃ প্রার্থনান্তে হোম সমাপ্ত করিবে। যে আসনে বসিয়া হোম করিবে, তাহা যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া রাখিবে, অন্য কেহ যেন ঐ আসন স্পর্শ না করে; অন্যে স্পর্শ করিলে সেই আসন পরিত্যাগ করিয়া নূতন আসন গ্রহণ করিবে।

পরদিন প্রত্যূষে হোমীয় ভস্মাদি স্থানান্তরিত করিয়া গৃহটী উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিবে। গৃহের কোন স্থানে দুর্গন্ধ ও অপবিত্র দ্রব্য বা ময়লা না থাকে। হোমীয় দ্রব্যাদির সংগ্রহ এবং হোমগৃহ পরিষ্কার প্রভৃতি স্বয়ং করিবে, অন্যের প্রতি ভারার্পণ করিবে না। হোমগৃহে কাষ্ঠপাদুকা (খড়ম) ব্যবহার করিবে, যেহেতু রিক্তপদে কোথাও পদচারণ করা কর্ত্তব্য নহে। অন্যত্র চর্ম্মপাদুকা ও ছত্র ব্যবহার করিবে। ফলতঃ যাহাতে শরীরের অনর্থক ক্লেশ হয়, তাহা করিবে না। **অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্র, গাত্রমার্জ্জনী, পাদুকা ব্যবহার করিবে না।**

* দ্বিজগণ বৈদিক নিয়মে সন্ধ্যাহ্নিক ও হোমাদি করিবে এবং দ্বিজেতরগণ স্ব স্ব কুলদেবতার মন্ত্রে (দীক্ষা না হইলে দেবতার নামে) হোম করিবে।

আহার-বিধি

আহারশুদ্ধি ব্রহ্মচর্য্য-সাধনের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। শরীরের জন্য এবং মনের জন্য যাহা গ্রহণ করা যায়, তাহার নাম আহার। শরীরের জন্য খাদ্য ও মনের জন্য বিষয় (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসম্বন্ধীয় চিন্তা, যথা—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি) গ্রহণ করা যায়। অতএব আহারশুদ্ধি বলিলে সাত্ত্বিক খাদ্য ও সাত্ত্বিক চিন্তা বুঝিবে। এই উভয়বিধ আহার পরস্পরসাপেক্ষ, অর্থাৎ সাত্ত্বিক খাদ্য আহার না করিলে সাত্ত্বিক চিন্তারও সম্ভাবনা নাই এবং সাত্ত্বিক চিন্তার অভাবেও সাত্ত্বিক খাদ্য গ্রহণে রুচির সম্ভাবনা নাই। সাত্ত্বিক আহারই যাবতীয় সংসারদুঃখ-দূরীকরণের একমাত্র উপায়। অতএব আহারশুদ্ধিবিষয়ে বিশেষ যত্ন আবশ্যক। লোভ ও কুচিন্তা পরিত্যাগ না করিলে আহারশুদ্ধির সম্ভাবনা নাই। শরীরের পুষ্টি, বল ও আরোগ্যের জন্যই খাদ্যগ্রহণ আবশ্যক। ফলতঃ রসনার ক্ষণিক তৃপ্তি আহারের উদ্দেশ্য নহে। এই কথা স্মরণ রাখিলে লোভ সহজেই ত্যাগ করা যায়।

সাত্ত্বিক খাদ্য সমাহিতচিত্তে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া প্রসাদস্বরূপ ভোজন করিবে। খাদ্য দ্বারা পাকস্থলীর অর্দ্ধেক এবং বিশুদ্ধ পানীয় দ্বারা পাদাংশ পূরণ করিবে, অবশিষ্ট পাদাংশ বায়ুসঞ্চালনের জন্য রাখিবে। ফলতঃ **আকাঙ্ক্ষা থাকিতেই ভোজন সমাপ্ত**

করিবে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার রাত্রে ভোজন করা বিধেয় নহে। **একাদশী তিথিতে অন্নাহার না করিয়া এক বেলা ফলমূল, দুগ্ধ ও আটা খাওয়া কর্ত্তব্য।**

যে সকল খাদ্য আয়ু, সত্ত্বগুণ, বল ও আরোগ্য, সুখ এবং প্রীতি বর্দ্ধন করে, সেই সকল খাদ্যই সাত্ত্বিক। যথা—দুগ্ধ, ঘৃত, শর্করা প্রভৃতি। অতি কটু, অত্যম্ল, অতি লবণ, অত্যুষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ এবং শীতলাবস্থাপ্রাপ্ত (বাসী), রসহীন (শুষ্ক), দুর্গন্ধ, পূর্ব্বদিনপক্ক (পচা বা পান্তা), উচ্ছিষ্ট (অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট) প্রভৃতি অপবিত্র খাদ্যই তামসিক। আর মৎস্য, মাংস, ডিম্ব, মাদক দ্রব্য, পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি রাজসিক।

সাত্ত্বিক খাদ্যই আহার করিবে। কিন্তু সাত্ত্বিক খাদ্যও অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিবে না। কেননা ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য যে পরিমাণ খাদ্য আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত পরিমাণ দ্রব্য গ্রহণ করিলেই অনিষ্ট হইবে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে সাত্ত্বিক খাদ্যও রাজসিক এবং তামসিক খাদ্যের ন্যায় কুফলজনক হইবে। এই জন্য মিতাহার কর্ত্তব্য এবং মিতাহারের জন্য আহার-বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক। সেই জন্যই **"আকাঙ্ক্ষা থাকিতে ভোজন সমাপ্ত করিবে।"** অর্থাৎ আরও কিছু খাইলে উপরের পাদাংশ (চতুর্থাংশ) খালি থাকিবে না, পূর্ণ হইয়া যাইবে, অতএব আর খাইব না এইরূপ মনে করিয়াই ভোজনক্রিয়া শেষ করিবে।

মোহান্ধ মানবগণ আহারের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া রসনার ক্ষণিক তৃপ্তিসাধন করিবার জন্য অসংখ্য দ্রব্যের স্বাদগ্রহণে লোলুপ হয়; সেই জন্যই জগতে মানুষের অখাদ্য প্রায় কিছুই দেখা যায় না এবং তজ্জন্যই জগতে অসংখ্য রোগেরও প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। যাহা হউক, তামসিক ও রাজসিক খাদ্য কখনও আহার করিবে না এবং সাত্ত্বিক খাদ্যের মধ্যেও অত্যল্প নির্দ্দিষ্টসংখ্যক আহার্য্য বলিয়া স্থির করিবে। নিতান্ত অভাবগ্রস্ত না হইলে সেই নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিবে না।

প্রাতে প্রাতঃকৃত্যের পর কিছু ছোলাভিজা, আদার কুচি ও লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া খাইবে এবং দুই-চারিখানা বাতাসা বা একটু চিনি কিম্বা মিশ্রি খাইয়া জলপান করিবে, অন্য কোন প্রকার জল খাইবে না। এই বঙ্গদেশে ন্যূনাধিক এক পোয়া তণ্ডুলের অন্ন উদরস্থ করিলেই মধ্যাহ্ন-ভোজনের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়। কেবল ঘৃত এবং দুগ্ধ দ্বারাই এই এক পোয়া তণ্ডুলের অন্ন উদরস্থ করা যাইতে পারে; ঘৃতের সহিত একটু চিনি বা মিশ্রি কিংবা কয়েকখানা বাতাসা মিশ্রিত করিলেই হইতে পারে। কিন্তু প্রত্যহ কেবল ঘৃত ও দুগ্ধ দিয়া অন্ন ভোজন করিলে চিরাভ্যাসবশতঃ আহারে অরুচি জন্মিতে পারে; তজ্জন্য ঘৃত-দুগ্ধ ব্যতীতও অন্যান্য খাদ্যের প্রয়োজন হইবে। অতএব অন্নের সহিত আলু-পটল বা আলু-বেগুন কিংবা হেলেঞ্চা

শাক সিদ্ধ করিয়া লইয়া তাহাতে ঘৃত ও লবণ মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিতে পার। মুগ, মটর, কালীকলাই বা ছোলার ডাইল রন্ধই করিয়াও অন্নের সহিত ভোজন করিতে পার। শরৎকালে পল্‌তার সুক্ত বা ডালনা এবং বসন্তকালে নিম-সুক্ত বা নিম-বেগুন-ভাজা আহার করিতে পার। কিন্তু ব্যঞ্জনে তৈল ব্যবহার করিবে না, ঘৃতই ব্যবহার করিবে।

তণ্ডুলের অন্ন, আটা বা সুজির রুটি, ঘৃত, দুগ্ধ, ডাইল (মুগ, মটর, ছোলা, কালীকলাই), তরকারী ও শাক (আলু, পটল, বেগুন প্রভৃতি ও হেলেঞ্চা, পলতা ও নিমপাতা) লেবু (কাগজী, পাতি), লবণ, চিনি, বাতাসা বা মিশ্রি —এই সীমার মধ্যেই আহার্য্য নির্ব্বাচন করিবে। নিতান্ত অভাবে না পড়িলে সীমার বাহিরে যাইবে না। কিন্তু রাজসিক ও তামসিক খাদ্য আহার করিবে না। আহার-সম্বন্ধে যতই ত্যাগ করিবে, ততই মঙ্গল জানিবে। দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ অধুনা ঘৃত-দুগ্ধের অভাব হইয়াছে এবং তজ্জন্য ঘৃত-দুগ্ধ দুর্লভ হইয়াছে। সুতরাং এরূপস্থলে যদি সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল না হয়, তাহা হইলে মনে করিতে পার যে, আমি গরীব লোক, দুগ্ধ-ঘৃত ভোজন আমার অসাধ্য। কিন্তু এরূপ মনে করিও না; কেননা রাজসিক ও তামসিক সমস্ত ভোজ্য পরিহার করিলে তোমার যে খরচা বাঁচিয়া যাইবে, তদ্দারা তুমি অক্লেশেই ঘৃত-দুগ্ধ

ভোজন করিতে পারিবে। সাত্ত্বিক খাদ্যের মধ্যে ঘৃত-দুগ্ধই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অতএব দুগ্ধ-নবনীত ভোজন করিতে যত্নশীল হইবে। দধি, তক্র ও ছানা আহার করিবে না।

অভ্যাস-অনুসারে আতপ বা সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্ন আহার করিবে। এ সম্বন্ধে অভ্যাস পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা নাই অর্থাৎ যদি তোমার সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্ন ভোজনের অভ্যাস থাকে, তবে সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্নই ভোজন করিবে, আতপ তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিবে না। কেননা তাহাতে শরীর অসুস্থ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আতপ তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিলে (কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি কারণে) যদি শরীরের গ্লানি না জন্মে তবে আতপ তণ্ডুলের অন্নই প্রশস্ত জানিবে। ঘৃতের মধ্যে গব্য ঘৃতই প্রশস্ত; কিন্তু অভাবে মহিষ-ঘৃতই ব্যবহার করিবে। পুরাতন তণ্ডুল যদি কীটজীর্ণ (পোকা লাগিয়া ছিদ্রবিশিষ্ট) হয়, অথবা বিস্বাদ বা অম্লরস হয় তবে তাহা ব্যবহার করিবে না। তৎপরিবর্ত্তে নূতন তণ্ডুলের অন্নই ব্যবহার করিবে। ফলতঃ অন্ন রুচিকর হওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য সাগু এরারুট প্রভৃতি বিস্বাদ খাদ্য (লঘুপাক হইলেও) ব্যবহার করিবে না। প্রত্যুত প্রীতিকর খাদ্যই ভোজন করিবে। তবে "আকাঙ্ক্ষা থাকিতেই ভোজন সমাপ্ত করিবে", এই মহামূল্য বাক্যটী স্মরণ রাখিবে।

একাদশীর দিন তণ্ডুলের অন্নের পরিবর্ত্তে সুজি বা আটার রুটী আহার করিবে। যদি অসুবিধা না হয়, তবে ষষ্ঠী,

একাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা—এই কয় তিথিতেই অন্নের পরিবর্ত্তে রুটি ব্যবহার করিতে পার। করিলে শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকার হইবে, কিন্তু না করিলেও বিশেষ অপকার হইবে না।

স্রোতস্বতী নদীর পরিষ্কৃত জল পান করাই উচিত। তদভাবে প্রশস্ত সরোবরের পরিষ্কৃত জল পান করিবে। তদভাবে সামান্য পুষ্করিণীর জল উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া লইবে এবং শীতল অবস্থায় সাবধানে ছাঁকিয়া লইয়া পান করিবে। অথবা বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে অবিশুদ্ধ জল যেরূপে চারিটি কলসী দ্বারা কয়লা ও বালির মধ্যে ছাঁকিয়া লইবার বিধান আছে, সেইরূপে জল বিশোধিত করিয়া লইবে। কিন্তু তদ্রূপে জল বিশোধিত করিবার পূর্ব্বেও উহা সিদ্ধ করিয়া লইবে। যদি পানীয় জল দূষিত মনে কর, তবে উষ্ণ দুগ্ধ এবং ডাব-নারিকেলের জল যথেষ্ট পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিবে।

ভোজনান্তে আচমনক্রিয়ার পরে মুখশোধনের প্রয়োজন কিন্তু **পান-সুপারী খয়ের-চুন মুখে দিবে না**। ধনে, মৌরী, লবঙ্গ, ছোট ও বড় এলাচের দানা এবং দারুচিনি, এইগুলি একত্র করিয়া একটী কৌটায় বা শিশিতে রাখিবে, ভোজনান্তে মুখশোধনের জন্য সেই মশলা কিঞ্চিৎ ব্যবহার করিবে। ভোজনান্তে মুখশোধন না করিলে মুখে দুর্গন্ধ হইবার সম্ভাবনা। এই মুখশোধন-মসলাগুলি পরিপাকক্রিয়ার সহায়তা করিবে

এবং মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট করিবে। হরিতকী ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা।

অপরাহ্ণে অর্থাৎ বেলা ৪।৫ টার সময় ক্ষুধার উদ্রেক হইলে কিছু জলখাবার আবশ্যক হয়। **এই জলখাবারের জন্য ফলমূলই যথেষ্ট**; যথা—নারিকেল, বেল, আম্র, কদলী, পেঁপে, কমলালেবু, কালজাম, সুপক্ক পেয়ারা, সুমিষ্ট লিচু, ইক্ষু, শাকআলু এবং দুগ্ধ, নবনী ও শর্করা—এই নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে নির্ব্বাচন করিবে। এতদ্ব্যতীত অন্যবিধ খাদ্য গ্রহণ করিবে না অর্থাৎ তরমুজ, শশা, কাঁঠাল, ফুটি, কুল প্রভৃতি না খাওয়াই ভাল এবং দধি, তক্র, ছানা, সন্দেশ, রসগোল্লা, লুচি, কচুরি, মিঠাই প্রভৃতি ভক্ষণ করিবে না। পুনঃ, **মুড়ি চাল-কালই ভাজা প্রভৃতি শুষ্কদ্রব্য ভক্ষণ করিবে না।** নারিকেলশস্য চিনি মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিবে। একমাত্র নারিকেল দ্বারাই অপরাহ্ণের জলখাবার পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, অভাবপক্ষে অন্যান্য ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে।

রাত্রি ৮।৯ টায় ক্ষুধার উদ্রেক হইলে কিছু ভোজন করা আবশ্যক। ক্ষুধার উদ্রেক না হইলে ভোজন অনাবশ্যক, একথা বলাই বাহুল্য। অতএব রাত্রিতে দুধভাত বা দুধরুটি অল্প চিনি মিশাইয়া ভোজন করিবে—অন্য কিছু ভোজন করিবে না। যদি দুগ্ধের নিতান্ত অভাব হয়, তবে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নির্দ্দিষ্ট আহার্য্য সামগ্রী হইতে নির্ব্বাচন করিবে, কিন্তু **রাত্রিকালীন ভোজন অর্দ্ধাশন হওয়া আবশ্যক** অর্থাৎ ক্ষুধা থাকিতে ভোজন সমাপ্ত করিবে—রাত্রিতে কদাপি যেন পরিতৃপ্তিসহকারে ভোজন করিও না। **একাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা—এ তিন তিথিতে রাত্রিতে কিছুমাত্র আহার করিবে না।** অপরাহ্ণের জলখাবার দ্বারা দিবসের ভোজনব্যাপার সমাপ্ত করিবে।

খাদ্যদ্রব্যাদি স্বয়ং আহরণ করিয়া এবং পাক করিয়া আহার করাই প্রশস্ত। কিন্তু অধুনা এই নিয়ম সকলের পক্ষে সাধ্য নহে। যাহা হউক, স্বপাকভোজন সুসাধ্য না হইলেও অশুচি দ্রব্য আহার করিবে না। শুদ্ধাচারসম্পন্ন গুরুজনের হাতে আহার্য্য গ্রহণ করিতে পার। **হোটেলে ভোজন করা উচিত নয়, কোন স্থানে নিমন্ত্রণে গিয়া কিছুমাত্র ভোজন করিবে না।** ফলতঃ খাওয়া দূরে থাক্, বহু লোকের সমাগমস্থানেও যাওয়া অনুচিত। তবে সাংসারিক কার্য্যের অনুরোধে যদি তদ্রূপ স্থানে যাওয়া হয়, কিছুমাত্র আহার করিবে না। মদ, গাঁজা, আফিম, সিদ্ধি, তামাক, চুরুট, চা, কাফি প্রভৃতি **মাদক দ্রব্য সেবন করিবে না।**

কৃত্যচিন্তা

ভোজনান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তদনন্তর সাংসারিক প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি সম্পন্ন করিবে।

সাংসারিক কার্য্য সম্পাদনের জন্য অন্যান্য ব্যক্তির সংস্রব আবশ্যক বটে, কিন্তু সেই সংস্রব যত কমাইতে পার, তদ্বিষয়ে

চেষ্টা করিবে এবং নিম্নলিখিত বিধানগুলি স্মরণ রাখিবে, যথা—

[১] কোনরূপে কাহারও অন্তঃকরণে বেদনা দিও না।

[২] মিথ্যা কথা বলিও না।

[৩] যথাসাধ্য মৌন অবলম্বন করিবে। কিন্তু কথা না কহিলেও সহাস্য ভাব রক্ষা করিবে।

[৪] পরদ্রব্য অপহরণ করিও না।

[৫] স্বীয় অবস্থায় সর্বদাই সন্তুষ্ট থাকিবে। মনের সন্তোষবিধানজন্য,—(ক) সর্বজনের কল্যাণ কামনা করিবে; জগতের সকলকেই আত্মীয় মনে করিবে। কাহারও সমৃদ্ধি বা সুখ দেখিলে আনন্দিত হইবে। (খ) কাহারও দুঃখ দেখিলে করুণার্দ্র হইবে। (গ) কাহাকেও পুণ্যকার্য্য করিতে দেখিলে হর্ষ প্রকাশ করিবে। (ঘ) কাহাকেও পাপকার্য্য করিতে দেখিলে উপেক্ষা করিবে। অর্থাৎ দেখিয়াও দেখিবে না, শুনিয়াও শুনিবে না, তদ্বিষয়ে চিন্তাও করিবে না।

[৬] স্বীয় মৃত্যুর কথা স্মরণ রাখিয়া ধৈর্য্য বা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবে; অপকারীর অপকার করিতে চেষ্টা করিবে না।

[৭] দেবগণ সতত তোমার রক্ষা বিধান করিতেছেন, কেহই তোমার অপকার করিতে সমর্থ নহে, এই বিশ্বাস হৃদয়ে নিহিত রাখিবে। যাহা আপাততঃ তোমার অপকারী বলিয়া বোধ হইবে, পরে তাহাই তোমার পরম ইষ্টসাধক

হইবে, ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করিবে। কদাপি দেবগণের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যেন সয়তানের বশীভূত হইও না। অর্থাৎ সহিষ্ণুতা পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধের বশীভূত হইও না।

[৮] যদি তুমি অন্যের চাকর হও, তবে প্রভুর কার্য্যকে স্বীয় কার্য্য মনে করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিবে। যে ধর্ম্মসাধনের ইচ্ছা করে, সে যে-কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, সেই অবস্থাতেই ধর্ম্মসাধন করিতে পারে। এই সংসার অনিত্য; এখানে কামনার বস্তু কিছুই নাই; সুতরাং নিষ্কাম বা উদাসীন-ভাবেই স্বীয় জড় দেহকে যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত করিবে। বাগানের মালি যেমন প্রভুর জন্য বৃক্ষের ফলাদি রক্ষা করে এবং স্বয়ং স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকে, তুমিও তদ্রূপ এই সংসার-উদ্যানে আপনাকে ভগবানের মালি মনে করিয়া স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকিবে। ফলতঃ সাংসারিক কার্য্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য্য—এই ষড়-রিপুর দমন করিবে। সর্ব্বদা কুবৃত্তিগুলির প্রতি তীক্ষ্ণ মানসদৃষ্টি রাখিবে। এই সকল দুর্বৃত্তির অধীন হইলে উন্নত দেবতারা তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন এবং সয়তানগণ অর্থাৎ ভূত, প্রেত, পিশাচাদি নিকৃষ্ট দেবযোনিগণ তোমাকে বশীভূত করিয়া নরকযন্ত্রণা প্রদান করিবে—এই কথা নিয়ত স্মরণ রাখিবে।

সদাচার

অপবিত্র বস্তু দর্শন এবং অপবিত্র ভাষা শ্রবণ করিলে চিত্ত-শুদ্ধির ব্যাঘাত হয়। আর অপবিত্র বস্তু স্পর্শন, ঘ্রাণ ও আস্বাদন করিলেও চিত্তশুদ্ধির হানি হয়। অতএব যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি যত্নবান্ হইবে।

ভক্তিভাজন গুরুজন ব্যতীত অন্যের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। **দৃষ্টি সর্ব্বদা অধোনত করিয়া রাখিবে** অথবা পবিত্র বস্তু নিরীক্ষণ করিবে। ধাতুদ্রব্য. পত্র, পুষ্প, গো, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, দেবমূর্ত্তি বা দেবতার ছবি প্রভৃতি দৃশ্য। গুরুজন ব্যতীত অন্যের সহিত বাক্যালাপ করিবার সময়ও তাহার চক্ষুর দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না।

কাহারও সহিত একাসনে বসিবে না। অর্থাৎ সংস্পর্শ বা সঙ্গদোষ যথাসাধ্য পরিত্যাগ করিবে। যেমন সুরভি পুষ্প হইতে নিয়ত সৌরভ নিঃসৃত হয় এবং যেমন মৃতদেহ হইতে নিয়ত পূতিগন্ধ নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ প্রত্যেক ব্যক্তির (সাধু মহাত্মা ব্যতীত) শরীর হইতে অপবিত্র পরমাণু নিঃসৃত হইতেছে, ইহা স্মরণ রাখিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া জনসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে।

নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত অন্য সময় গৃহমধ্যে থাকিবে না। নির্ম্মল বায়ু-সঞ্চালিত অনাবৃত স্থানেই দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে চেষ্টা করিবে। অনাবৃত উচ্চস্থান

(ছাদ, পাহাড় প্রভৃতি), বন, উপবন, ময়দান এবং প্রশস্ত নদী বা সরোবরতীরে একাকী বসিয়া ভগবানের চিন্তা করিবে।

বাক্‌সংযম ও শ্রুতিসংযম অভ্যাস করিবে। পাপ-কথা শ্রবণ করিবে না, পাপ-চিন্তা করিবে না। পাপীর কথা আন্দোলন বা কাহারও নিন্দা-চর্চ্চা বা কুকার্য্যের সমালোচনা করিবে না। নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিবে না। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই অগ্রে মনে মনে চিন্তা করিবে, কি কি কথা বলা আবশ্যক; পরে কথা বলিবে। অতিরিক্ত বাক্যব্যয় করিবে না এবং অনাবশ্যক কথা শুনিতে চেষ্টা করিবে না। ফলতঃ যথাসাধ্য বাক্‌সংযম করিবে। বাক্‌সংযম চিত্তশুদ্ধি-সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় জানিবে। কিন্তু তাই বলিয়া মুখে যেন কদাচ পরুষ ভাব না আসে। মুখখানি সর্ব্বদাই সরস ও সহাস্য রাখিতে চেষ্টা করিবে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সাংসারিক কার্য্য সমাপ্ত করিবে। অর্থাৎ দিবাবসানের সঙ্গে তোমার সাংসারিক কার্য্যেরও যেন অবসান হয়।

সায়ংকৃত্য

দিবসীয় কার্য্যের অবসানে কিছুক্ষণ আত্মচিন্তা ও নিত্যানিত্য বিচার করিবে।

"জন্মাবধি এ পর্য্যন্ত এই জগতে আমি বিস্তর ক্লেশ ভোগ করিয়াছি। আমার সমগ্র জীবনই ক্লেশময়। যাহাকে সুখ মনে করা যায়, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা সুখ নহে; তাহাও দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তি মাত্র। আহার করিয়া আমরা সুখ লাভ করিতে পারি না, ক্ষুধাব্যাধি হইতে ক্ষণিক নিবৃত্তিলাভ করি মাত্র। ফলতঃ ঔষধসেবনে সুখ নাই, ব্যাধিযন্ত্রণা হইতে কিছুক্ষণ নিষ্কৃতিলাভ করি মাত্র। সাংসারিক যাবতীয় সুখই এইরূপ অশেষ ক্লেশের ক্ষণিক নিবৃত্তি মাত্র।

"জন্মাবধি মৃত্যু আমাকে যেন আকর্ষণ করিতেছে। মরিতেই হইবে, এ বিষয়ে সংশয় নাই, তথাপি আমি ঘোর মায়াবশে এই সংসারকে চিরস্থির মনে করি এবং কখনও স্বীয় মৃত্যু-চিন্তা করি না, অথচ আমি মৃত্যুভয়ে সতত ভীত। প্রতিদিনই আমার আয়ুক্ষয় হইতেছে। না জানি সেই মৃত্যুসময়ে কত যন্ত্রণাই পাইব!

"এই ত দিবাবসান হইল; সূর্য্যদেব অস্তগমন করিলেন, আমাকে একদিন মরিতে হইবে। আবার সূর্য্য উদয় হইবে, আমাকেও আবার জন্মিতে হইবে। কালের ত অন্ত নাই; এই অনন্তকাল কি আমি কেবল অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া এই জগতে জন্মিব এবং মরিব? এই অনন্ত ক্লেশপ্রবাহের কি নিবৃত্তি হইবে না? এই ক্লেশমুক্তির কি উপায় নাই? এই বিষয়ে কি কেবল আমিই চিন্তা করিতেছি?—না অনাদি কাল হইতে কত মহাত্মা চিন্তা করিয়াছেন। কত মহাত্মা মহাজন এই ক্লেশ-প্রবাহ হইতে নিষ্কৃতিলাভের পন্থাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ এই

আর্য্যভূমি ভারতে কত মহাত্মা আজীবন কেবল মুক্তিপথেরই অন্বেষণ করিয়াছেন। তবে ক্ষুদ্রবুদ্ধি মূঢ় আমি আর কি চিন্তা করিব? আর কি নূতন পন্থা আবিষ্কার করিব? সম্মুখে ত প্রশস্ত মুক্তিপথ দেখিতেছি, সুতরাং আর নূতন মুক্তিপথের প্রয়োজন কি? যে পথ দেখিতেছি, সেই পথে গেলেই তো মুক্তিলাভ করা যায়। কিন্তু আমি মোহবশে সে পথে যাইতে পারিতেছি না।

"যে সংসারকে অনিত্য এবং ক্লেশময় জানিতেছি, অনুভব করিতেছি, সেই সংসারেই আমার প্রবল আসক্তি রহিয়াছে। আমি পাশবদ্ধ পশুর ন্যায় নিয়ত সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতেছি এবং নিয়ত ক্লেশভোগ করিতেছি। এই মায়াপাশ ছেদনের উপায় কি? এই পাশ ছেদন করিতে না পারিলে আমি মুক্তিপথ অবলম্বন করিব কিরূপে? পাশবদ্ধ পশু স্বেচ্ছানুসারে কোথাও যাইতে পারে না; আমিও স্বেচ্ছানুসারে কোথাও যাইতে পারিতেছি না, আমারও স্বাধীনতা নাই। কিরূপে আমি স্বাধীনতা পাইব? কে আমাকে পাশমুক্ত করিবে? প্রভু ইচ্ছা করিলেই পশুকে পাশমুক্ত করিতে পারেন। আমারও অবশ্য প্রভু আছেন; আমি সেই প্রভুর একান্ত শরণাপন্ন হইলে তিনি অবশ্যই আমার বন্ধন মোচন করিবেন। অতএব আমি ত্রিলোকপতি সদ্‌গুরুর উপাসনা করিব—তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিব।'

এবম্প্রকার চিন্তার পরে স্বীয় হোমগৃহে কবাট রুদ্ধ করিয়া শুদ্ধাসনে উপবেশন করতঃ দীপালোকে কুলদেবতার বা ইষ্ট-দেবতার মূর্ত্তি বা ছবি একাগ্রচিত্তে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিবে।*

* তোমার পিতৃ-পিতামহাদির ঊর্দ্ধতন পুরুষগণ যে দেবতার উপাসক ছিলেন, সেই দেবতাকেই স্বীয় কুলদেবতা বা ইষ্টদেবতা বলিয়া

পরে চক্ষু মুদ্রিত করিলে মানসনেত্রে অবিকল সেই ছবি দেখিবে। যদি চক্ষু মুদ্রিত করিলে মানসনেত্রে সেই ছবি অবিকল সুস্পষ্ট দেখিতে না পাও, তবে পুনরায় চক্ষু উন্মীলিত করিয়া কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিবে। অনন্তর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মানসনেত্রে সেই ছবি দেখিবে এবং তাঁহাকেই ত্রিলোকপতি সদ্গুরু মনে করিয়া নিম্নলিখিতরূপে প্রার্থনা করিবে—

"হে অনন্তদেব! আমার ক্ষুদ্র হৃদয় তোমার বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিতে অসমর্থ হওয়াতেই আমি তোমার এই মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছি। হে ব্রহ্মন্! হে মঙ্গলময় দেব! তুমি এই মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া ত্রিতাপক্লিষ্ট আমাকে বন্ধনমুক্ত কর। হে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী প্রণবরূপী ভগবান্! হে সত্যস্বরূপ গুরুদেব! তুমি আমার মোহপাশ ছেদন কর।"

এই প্রার্থনার পরে চক্ষু মুদ্রিত রাখিয়াই এবং ইষ্টমূর্ত্তি মানসনেত্রে নিরীক্ষণ করিতে করিতেই ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিবে।

একাসনে বসিয়া অন্যূন এক হাজার আট বার মন্ত্র জপ করিতে হইবে। জপ করিবার সময় মানসনেত্রে ইষ্টদেবের মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে হইবে, অথচ জপসংখ্যাও রাখিতে হইবে।

জানিবে। কিম্বা যে দেবতা তোমার হৃদ্য বা প্রীতিকর, সেই দেবতাকেই তুমি স্বীয় ইষ্টদেব বলিয়া গ্রহণ করিবে। গুরুকুলোৎপন্ন ভক্তিভাজন ব্যক্তির নিকট ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিবে। তদভাবে অন্য যে কোন ভক্তি-ভাজন ব্যক্তির নিকটেও মন্ত্র গ্রহণ করিতে পার।

—এজন্য এক হাজার আটটী গুটিকাবিশিষ্ট মালার প্রয়োজন। রুদ্রাক্ষ বা তুলসীমালাই প্রশস্ত। তদভাবে অন্য যে কোন রূপ মালা গ্রহণ করিতে পার। জপ করিবার সময় দন্ত চাপিয়া রাখিবে, ওষ্ঠাধর সম্মিলিত রাখিবে, জিহ্বাও স্থির রাখিবে; কেবল জিহ্বামূল ও কণ্ঠনালীর সাহায্যে মন্ত্রজপ করিবে। হোমের সময়ও এইরূপ জপ করিতে হইবে।

দিবাভাগে সাংসারিক কার্য্যের অবসরেও জপ করিবে; কিন্তু সেই সময় জপসংখ্যা রাখিবার প্রয়োজন নাই। প্রকাশ্য স্থানে অর্থাৎ কাহারও সাক্ষাতে কখনও মালাজপ করিবে না। কিন্তু যখনই যে কার্য্য করিবে, তখনই সেই কার্য্যে একান্ত মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। অতএব জপ করিলে যদি সাংসারিক কাজের ক্ষতি হয়, তবে জপ করিবে না। **অবসর পাইলে জপ করিবে।** কিন্তু রাত্রিতে যখন জপ করিবে, তখন সাংসারিক কাজের চিন্তা করিবে না - একথা বলাই বাহুল্য।

রাত্রিকৃত্য

অষ্টোত্তর সহস্র জপ সমাপ্তির পর রাত্রিকালের আহার গ্রহণ করিবে। আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবে, সেই বিশ্রামের সময় সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া মনকে নিশ্চিন্ত করিবে। মন কিছুক্ষণ নিশ্চিন্ত হইলেই নিদ্রাবেশ উপস্থিত

হইবে। তখন পরিষ্কৃত শয্যায় **একাকী শয়ন করিবে।** যদি শয়নগৃহে স্ত্রীর সহিত বা অন্যান্য ব্যক্তির সহিত শয়ন করা নিতান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলেও সংস্পর্শরহিত পৃথক্ শয্যায় শয়ন করিবে।

যতদিন সম্পূর্ণ চিত্ত-নিরোধ না হইবে, ততদিন স্ত্রী-সহবাস করিবে না, ইহা বলাই বাহুল্য। স্ত্রী-সহবাস দূরে থাক, স্ত্রীর মুখ দর্শন করিবে না, স্ত্রীর সহিত কথোপকথন করিবে না। তদ্রূপ করিলেই শোণিত হইতে বীর্য্যবিন্দু পৃথক্ হইয়া পড়িবে এবং ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাঘাত ঘটিবে। শয়ন করিবামাত্র যদি নিদ্রাবেশ না হয়, তবে শয়ন করিয়াও জপ করিবে। এই সময় জপের সংখ্যা রাখিবার প্রয়োজন নাই। জপ করিতে করিতেই নিদ্রাবেশ হইবে।

ব্রহ্মচর্য্য-সাধন

—০:*:০—

সাধন-প্রণালী

—:০:—

আহারশুদ্ধি

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য কি ?—শরীরস্থ শুক্রধাতুকে অবিকৃত ও অবিচলিত অবস্থায় ধারণের নাম **ব্রহ্মচর্য্য** অর্থাৎ কায়, মন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বতোভাবে মৈথুনেচ্ছা পরিত্যাগ করাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে। ইচ্ছা মাত্রেই মানসিক বৃত্তি; আবার মনের সহিত শরীরের এবং শরীরের সহিত খাদ্যের বিশেষ সম্বন্ধ। মন ও শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে আহার-বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হয়। যাহা দেহ ও মনের উন্নতিকর এবং হিতজনক, তাহাই প্রশস্ত খাদ্য। যাহা উদরস্থ হইলে দেহে কোনও প্রকার রোগ না হয়, অথচ শরীর বলিষ্ঠ হয়, চিত্তের প্রসন্নতা সংসাধিত হয়, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সম্প্রসারণ হয়—শৌর্য্য, বীর্য্য, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতির বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ আহার্য্যই প্রশস্ত। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়প্রীতিকর খাদ্য ভক্ষণ করা আহারের চরম উদ্দেশ্য নহে। ফল কথা

আহার্য্যের গুণানুসারে মানুষের গুণের তারতম্য হয়। অতএব আহার্য্য বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। আহারের সম্বন্ধে শাস্ত্রের উক্তি এই—

আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।
স্মৃতিলাভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ॥

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ

—আহারশুদ্ধি হইলেই সত্ত্বশুদ্ধি জন্মে, সত্ত্বশুদ্ধি হইলে নিশ্চিত স্মৃতিলাভ হয় এবং স্মৃতিলাভ হইলে মুক্তি অতীব সুলভ হইয়া থাকে।

অতএব সর্ব্বপ্রকারে যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা আহারশুদ্ধি-বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সত্ত্বগুণই সকলের চরম লক্ষ্যস্থানীয় সুতরাং রজঃ ও **তমোগুণবিশিষ্ট খাদ্য কদাপি ভোজন করিবে না।** তাই আমরা পূর্ব্বে খাদ্য প্রভৃতি শারীরিক সংযমের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত পরিষ্কৃত, সুমিষ্ট, সুরস, স্নেহযুক্ত ও কোমল খাদ্য দ্বারা উদরের তিন ভাগ পূর্ণ করিয়া বাকী অংশ বায়ুচালনের জন্য শূন্য রাখিবে। বলা বাহুল্য, যতদিন শরীর দৃঢ় ও চিত্ত সংযত না হয়, ততদিন কেহ এই নিয়মের ব্যভিচার করিবে না। ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে আজীবন উক্ত নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। তবে যাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে, তাহারা স্বধর্ম্মানুসারে আহারের তারতম্য করিতে পারিবে।

চিত্তশুদ্ধি

মনের সংযমই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য। আহারশুদ্ধি হইলে মন পরিশুদ্ধ করিবার সাহায্য হয় মাত্র; কিন্তু মনের শুদ্ধি সম্পাদনই চরম লক্ষ্য। মনের শুদ্ধি না হইলে কখনও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা যায় না। মনঃসংযমের জন্য চেষ্টা না করিয়া আজীবন সাত্ত্বিক আহার করিলেও কোন ফল লাভ হইবে না। সকল ধর্ম্মের সার চিত্তশুদ্ধি। যাহারা ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মগ্রহণে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে এই কথার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতে হইবে। চিত্তশুদ্ধির সাধনাই ধর্ম্মের প্রধান সাধনা—মূল কথা। ইন্দ্রিয়দমন ও রিপুসংযম করিতে না পারিলে মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। ইন্দ্রিয়গণ অপ্রতিহত প্রভাবে একবার যথেচ্ছাচারী হইলে তাহাদিগকে স্ববশে আনা সাধ্যাতীত। ইন্দ্রিয়গণ চপলতাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্থির ভাব ধারণ না করিলে জ্ঞান কদাচ প্রকাশ পাইতে পারে না। মানবগণ ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইয়াই এককালে অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি সে সুখে আসক্ত না হয়, তাহারই পরমাগতি লাভ হইতে পারে। এই সকল মহৎ তত্ত্ব অবগত হইয়া আর্য্য-ঋষিগণ নিয়ম-সংযমের কঠোরতা করিয়াছেন। যাহার চিত্ত শমিত ও ইন্দ্রিয় দমিত হয় নাই, সে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ হইলেও ঘোর মূর্খ। মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন—

কাম ক্রোধ মদ লোভ কী জব্ তক্ মনমে খান্।
তব্ তক্ পণ্ডিত মূরখো তুলসী এক সমান॥

—মানবগণের চিত্তক্ষেত্রে যে পর্য্যন্ত কাম, ক্রোধ, মদ ও লোভের খনি বিদ্যমান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত পণ্ডিত মূর্খ সকলেই সমান।

অতএব ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বতোভাবে চিত্তসংযম অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। **মৈথুনেচ্ছা না থাকিলেও হিংসা ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণ মনকে উত্তেজিত করিবে, তাহাতে তোমার অজ্ঞাতসারে শুক্রবিন্দু স্খলিত হইবার সম্ভাবনা।** দুর্ভাবনায় নিদ্রা না হইলে স্বপ্নবিকার হইতে পারে। অতএব যাহাদের ব্রহ্মচর্য্য পালনের ইচ্ছা আছে, তাহারা দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত চিত্তের রজঃ ও তমোগুণান্বিত বৃত্তির বিরুদ্ধে সর্ব্বদা সাত্ত্বিক বৃত্তির অনুশীলন করিবে। সদসৎ সকলেই বুঝে; সর্ব্বদা অসৎ বৃত্তির বিরুদ্ধে সদ্‌বৃত্তির পরিচালনা করিবে।

পাতঞ্জলোক্ত যম ও নিয়ম পালন করিলেই চিত্ত শুদ্ধ হইবে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ—এই পাঁচটি যম এবং শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান —এই পাঁচটি নিয়ম। এই দশটি বৃত্তির সাধনা করিলে নিশ্চয়ই চিত্ত শুদ্ধ হইবে।

যম-সাধন

অহিংসা—মন, বাক্য ও দেহ দ্বারা সর্ব্বভূতের পীড়া উপস্থিত না করার নাম অহিংসা। যখন মনোমধ্যে হিংসার ছায়াপাত মাত্র না হইবে, তখনই অহিংসা সাধন হইবে।

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।
—পাতঞ্জল-দর্শন

যখন হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন অপরে তাহার নিকট আপন আপন স্বাভাবিক বৈরিতা পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ চিত্ত হিংসাশূন্য হইলে সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরাও তাহা করিবে না।

সত্য—পরহিতের জন্য বাক্য ও মনের যে যথার্থ ভাব তাহাকে সত্য বলে। সরল চিত্তে অকপট বাক্য, যাহাতে দুরভিসন্ধির লেশমাত্র নাই, তাহাই সত্যভাষণ। এ জন্য বাক্‌সংযম করা একান্ত কর্ত্তব্য। বহ্বালাপী মাত্রেই মিথ্যাবাদী। সুতরাং সত্যসাধনকালে বহ্বালাপ পরিত্যাগ করিবে। **প্রয়োজনীয় কথা ভিন্ন বাজে বাক্যব্যয় করিবে না।** সত্য স্বভাবগত হইলে আর মনে যখন মিথ্যার উদয় হইবে না, তখন সত্যসাধন হইবে।

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।
—পাতঞ্জল-দর্শন

অন্তরে সত্যপ্রতিষ্ঠা হইলে কোন কাজ না করিয়াই তাহার ফললাভ হইয়া থাকে। অর্থাৎ সত্যপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির বাক্য সিদ্ধ হয়। একমাত্র সত্য রক্ষা করিতে পারিলে সত্যস্বরূপ ভগবান্‌কে লাভ করা যায়।

অস্তেয়—পরের দ্রব্য অপহরণ পরিত্যাগ করার নাম অস্তেয়। পরদ্রব্য গ্রহণের ইচ্ছামাত্র যখন মনে উদিত হইবে না, তখনই অস্তেয় সাধন হইবে।

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্।
—পাতঞ্জল-দর্শন

অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার নিকট সমস্ত রত্ন আপনা-আপনি আসিয়া থাকে। অর্থাৎ অস্তেয়প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কখনও ধনরত্নের অভাব হয় না।

ব্রহ্মচর্য্য—এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিতে হইবে।

অপরিগ্রহ—দেহরক্ষার অতিরিক্ত ভোগসাধন পরিত্যাগ করার নাম অপরিগ্রহ। ফল কথা, লোভ পরিত্যাগ করাকে অপরিগ্রহ বলা যায়। যখন 'ইহা চাই' 'উহা চাই' এরূপ মনেই হইবে না, তখনই অপরিগ্রহ সাধন হইবে।

অপরিগ্রহপ্রতিষ্ঠায়াং জন্মকথন্তাসংবোধঃ।
—পাতঞ্জল-দর্শন

অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্ব্বজন্মের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইবে।

নিয়ম-সাধন

শৌচ—শরীর ও মনের মালিন্য দূর করার নাম শৌচ। তাই বলিয়া সাবান, ফুলেলা বা এসেন্স প্রভৃতি বিলাসিতার বাহার নহে। গোময়, মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা শরীরের এবং দয়াদি সদ্‌গুণ দ্বারা মনের মালিন্য দূর করিতে হয়।

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসঙ্গশ্চ।
—পাতঞ্জল-দর্শন

শুচি থাকায় নিজ দেহকে অশুচিবোধে তৎপ্রতি অবজ্ঞা জন্মে এবং পরসঙ্গ করিতেও ঘৃণা জন্মায়। তাহা হইলে আর রমণীর আসঙ্গ-স্পৃহা জন্মিবে না।

সন্তোষ—প্রতিদিন যদৃচ্ছালাভে মনে সন্তুষ্টিরূপ বুদ্ধি রাখাকেই সন্তোষ বলে। স্থূল কথা, দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করার নাম সন্তোষ। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলির ত কথাই নাই ; যশ, মান, সম্ভ্রম প্রভৃতিই বা ক'দিন স্থায়ী? এইরূপে বিষয়ের অসারতা ও অস্থায়িত্ব প্রকৃষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেই সন্তোষ-সাধন হইবে।

সন্তোষাদনুত্তমসুখলাভঃ।
—পাতঞ্জল-দর্শন

সন্তোষসিদ্ধি হইলে অনুত্তম সুখলাভ হয়। সে সুখ অনির্ব্বচনীয় বিষয়নিরপেক্ষ সুখ অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর সহিত সে সুখের কোন সম্বন্ধ নাই।

তপস্যা—বেদবিধানানুসারে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রতোপবাস করাকে তপস্যা বলে।

কায়েন্দ্রিয়শুদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াৎ তপসঃ।

—পাতঞ্জল-দর্শন

তপস্যাদ্বারা শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের অশুদ্ধি ক্ষয় হইয়া যায়। অর্থাৎ দেহশুদ্ধি হইলে ইচ্ছানুসারে দেহকে স্থূল বা সূক্ষ্ম করিবার ক্ষমতা জন্মে এবং 'ইন্দ্রিয়শুদ্ধি' হইলে সূক্ষ্ম দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদগ্রহণ ও স্পর্শন ইত্যাদি সূক্ষ্ম বিষয়সকল গ্রহণে শক্তি জন্মে।

স্বাধ্যায়—প্রণব ও সূক্তমন্ত্রাদির অর্থ চিন্তাপূর্ব্বক জপ এবং বেদ ও ভক্তিশাস্ত্রাদি ভক্তিপূর্ব্বক অধ্যয়ন করাকে স্বাধ্যায় বলে।

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ।

—পাতঞ্জল-দর্শন

স্বাধ্যায় দ্বারা ইষ্টদেবতার দর্শন লাভ হইয়া থাকে।

ঈশ্বরপ্রণিধান—ভক্তিসহকারে ঈশ্বরে চিত্তসমর্পণ করিয়া তাঁহার উপাসনার নাম ঈশ্বরপ্রণিধান।

সমাধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ।

—পাতঞ্জল-দর্শন

ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারা যোগের চরম ফল সমাধিসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা যত শীঘ্র চিত্তের শুদ্ধতা সাধিত হয়, অন্যপ্রকারে তত শীঘ্র কখনই কার্য্যসিদ্ধি হয় না; কেননা,

তাঁহার চিন্তায় তাঁহার ভাস্বর জ্যোতিঃ হৃদয়ে আপতিত হইয়া সমস্ত মলিনতা বিদূরিত করিয়া দেয়।

এই সমস্তই চিত্তশুদ্ধির সাধনা। পূর্ণ মানুষ হইয়া প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সকল দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোক-দিগকে এই যম ও নিয়ম-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে। সাধনা অর্থে অভ্যাস বা অনুশীলন। সর্ব্বদা অসদ্‌বৃত্তির অপকারিতা এবং সদ্‌বৃত্তির উপকারিতা অনুশীলন করিবে। দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক এক-একটি অসদ্‌বৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে। তাহা হইলে ক্রমশঃ অসদ্‌বৃত্তি ক্ষীণ হইয়া সদ্‌বৃত্তিসকল বিকশিত হইবে।

ক্রোধজয়

যতগুলি রিপু আছে, তাহার মধ্যে ক্রোধ দ্বিতীয় রিপু। কাম বাধা পাইয়াই ক্রোধরূপে প্রকাশ পায়। এমন চিত্ত-উত্তেজক রিপু (কাম ব্যতীত) আর একটীও নাই। ক্রোধে কি কি কুফল উৎপন্ন হয়, তাহা সর্ব্বদা আলোচনা করিবে। ক্রোধ মনুষ্যের পরম শত্রু। ক্রোধে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নাশ করে। ক্রোধান্বিত ব্যক্তির মুখের প্রতি দৃষ্টি করিলে বোধ হয়, কোন পিশাচ দ্বারা সে আক্রান্ত হইয়াছে। ক্রোধের উত্তেজনায় সময়-সময় মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে দেখা গিয়াছে। এইরূপ ক্রোধের কুফল এবং ক্রোধদমনের মহত্ত্ব চিন্তা করিতে থাকিলে কালে সুফল লাভ করা যাইবে।

ক্রোধের বিপরীত বৃত্তি দয়া; সর্ব্বদা দয়া-বৃত্তির অনুশীলন করিলে ক্রোধের হ্রাস হয়। কাম, লোভ, অহঙ্কার এবং পরদোষের আলোচনা যত কমাইতে পারিবে, ক্রোধ ততই কমিয়া যাইবে। ক্ষমা, শান্তি ও দয়ার যত অধিক সাধনা করিবে ততই ক্রোধের হ্রাস হইবে। বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনপূর্ব্বক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ক্রোধ জয় করিতে চেষ্টা করিবে।

পরিকর্ম্ম-সাধন

হিন্দুশাস্ত্র উপদেশ দিয়া থাকেন, অপরের সুখ, দুঃখ, পুণ্য ও পাপ দেখিলে যথাক্রমে **মৈত্রী, করুণা, মুদিতা** ও **উপেক্ষা** করিবে। অর্থাৎ পরের সুখ দেখিলে সুখী হইও, ঈর্ষ্যা করিও না। পরের সুখে সুখী হইতে অভ্যাস করিলে তোমার ঈর্ষ্যানল দূরীভূত হইবে। তুমি যেমন সর্ব্বদা আত্ম-দুঃখ নিবারণের ইচ্ছা কর, পরের দুঃখ দেখিলেও ঠিক সেইরূপ করিও। আপনার পুণ্যে বা শুভানুষ্ঠানে যেমন হৃষ্ট হও, পরের পুণ্য বা শুভানুষ্ঠানে সেইরূপ হৃষ্ট হইও। পরের পাপে বিদ্বেষ করিও না, ঘৃণা করিও না, ভাল-মন্দ কিছুই আন্দোলন করিও না—সর্ব্বতোভাবে উদাসীন থাকিও। ঐরূপ থাকিলে মনের অমর্ষ-মল নিবারিত হইবে। যেন মনে থাকে, কেহ আমায় অত্যাচার উৎপীড়ন করিলে, কেহ আমার কোন দ্রব্য চুরি করিলে, কেহ দুরভিসন্ধিপ্রণোদিত হইয়া আমার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে আমার যেমন কষ্ট হয়,

কাহারও প্রতি আমার দ্বারা ঐসকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে সে ব্যক্তিও এইরূপ কষ্ট পাইয়া থাকে। নিজ হৃদয়ের বেদনা অনুভব করিয়া পরের প্রতি ব্যবহার করিবে। যখন গলিত পত্র ও বন্যজাত কটুকষায় কন্দ-মূল-ফল খাইয়াও মনুষ্য জীবিত থাকে তখন পরের প্রাণে কষ্ট দিয়া দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিয়া উদরপূর্ত্তি করা কেন? ক'দিনের জন্য ভবের বৈভব? যখন শৈশবের বিমল জ্যোৎস্না দেখিতে দেখিতে ডুবিয়া যায়—যৌবনের বলবিক্রম জোয়ারের জল—প্রৌঢ়াবস্থা তিন দিনের খেলা—সংসার পাতিতে না পাতিতেই ফুরাইয়া যায়—"এ-পর্য্যন্ত উচিৎ অবস্থায় জীবন কাটান হয় নাই", "তার মনে কষ্ট দিয়াছি", "তার সহিত এরূপ ব্যবহার করা ভাল হয় নাই", —যখন এই আক্ষেপ করিতে করিতে বার্দ্ধক্য কাটিয়া যায়, তখন দু'দিনের জন্য আসক্তি কেন? অন্যের প্রতি বলপ্রকাশ করা কেন? দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করা কেন? পরনিন্দায় স্ফুর্ত্তি কেন? পার্থিব পদার্থের জন্য অনুশোচনা করা কেন?

মৃত্যুচিন্তা

আর এক কথা। সর্ব্বদা সর্ব্ব অবস্থায় যেন মনে থাকে **আমাকে মরিতে হইবে**। আমাদের মস্তকের উপর যমের ভীমদণ্ড নিয়ত বিঘূর্ণিত হইতেছে। কোন্ মুহূর্ত্তে মরণের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। কখন কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে কাল অলক্ষিতে আসিয়া গ্রাস করিবে,

কে জানে? ভাল-মন্দ যে কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে —"আমাকে একদিন মরিতে হইবে"—এই ভাবিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে। মরণের কথা মনে থাকিলে আর মরজগতে মদন-মরণের অভিনয় করিতে মন অগ্রসর হইবে না।

এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে সকলই অনিশ্চিত, কোন বিষয়ের স্থিরতা বা নিশ্চয়তা নাই, কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিত। ছায়া যেমন বস্তুর অনুগামী, মৃত্যুও তেমনি দেহীর সঙ্গী। শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি—

"অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্ব্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ।"

আজ হউক, কাল হউক বা দু'দশ বৎসর পরেই হউক, একদিন সকলকেই সেই সর্ব্বগ্রাসী শমনসদনে যাইতে হইবে। অগণ্য সৈন্যসমাবৃত লোকসংহারকারী শস্ত্রসমন্বিত সম্রাট হইতে বৃক্ষতলবাসী ছিন্নকন্থাসম্বল ভিখারী পর্য্যন্ত সকলকেই একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। মৃত্যু অনিবার্য্য। মৃত্যু বয়সের অপেক্ষা করে না, সাংসারিক কার্য্য সম্পাদনের অসম্পূর্ণতা ভাবে না; মৃত্যুর মায়া-মমতা নাই, কালাকাল বিচার নাই। মৃত্যু কাহারও অনুরোধ-উপরোধ শুনে না। —কাহারও সুবিধা-অসুবিধা দেখে না—কাহারও সুখ-দুঃখ বোঝে না—কাহারও ভাল-মন্দ ভাবে না—কাহারও পূজা-অর্চ্চনা চাহে না—কাহারও তোষামোদ বা প্রলোভনে ভুলে না—কাহারও রূপ-গুণ কুল-মান মানে না—কাহারও ধন-গৌরবের প্রতি দৃক্‌পাত করে না। কত দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত

মহারথী এই ভারতে জন্মগ্রহণ করতঃ আপন আপন বলবীর্য্যে সসাগরা বসুন্ধরা কম্পিত করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই জীবিত নাই —সকলেই করাল মৃত্যুর কবলিত হইয়াছেন। বাস্তবিক মনুষ্যের এমন কোন শক্তি নাই, যদ্দ্বারা দারুণ বিভীষিকাময় মৃত্যুর গতিরোধ করা যায়। শারীরিক বল, বীর্য্য, ধন, জন, সম্পদ, মান, গৌরব, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ, প্রভুত্ব প্রভৃতি সর্ব্বগর্ব্ব মৃত্যুর নিকট খর্ব্ব হইবে। এই মৃত্যুর কথা ভাবিয়াই কত ব্যক্তি সর্ব্ব-মায়া পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মজগতে মহাজনপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই কারণে বলিতেছি, সর্ব্বদা মৃত্যুচিন্তা করিয়া কার্য্য করিলে হৃদয়ে পাপ স্থান পাইবে না—দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে চিত্ত ধাবিত হইবে না—বিষয়-বিভব, আত্মীয়-স্বজনের মায়া শতবাহু সৃজন করিয়া আসক্তিশৃঙ্খলে বাঁধিতে পারিবে না। যেন মনে থাকে, আমাদিগের মত কতজন এই সংসারে আসিয়াছিলেন; এই ধনৈশ্বর্য্য, এই ঘর-বাড়ী "আমার" "আমার" বলিয়াছিলেন; আমাদের মত স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণকে স্নেহের শতবাহুতে জড়াইয়া ধরিতেন—কিন্তু হায়! এখন তাঁহারা কোথায়? যে অজানা দেশ হইতে আসিয়াছিলেন সেই অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছেন। তাই বলি, পার্থিব পদার্থের উপর "আমার" মার্কা জোরে বসাইও না। আমাদের শিয়রে করাল মৃত্যু নৃত্য করিতেছে। কর্ম্ম-সূত্রের পরিচ্ছেদে এই সংসার। এই বিষয়-সম্পত্তি পড়িয়া থাকিবে—অনাদি অনন্তকাল হইতেই ইহা পড়িয়া আছে;

আমার মত কতজন—আমারই পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি এই বাড়ীর উপরে—ঐ জমির উপরে—পুকুর-বাগানের উপরে দু'দিনের জন্য দানবী দীপ্তির চাহনি চাহিয়া, বাসনা-বিলাসের আলিঙ্গন-বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু কালে কালের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছেন ; যাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডারের জিনিষ তাঁহারই ভাণ্ডারে পড়িয়া আছে। আমি ভগবানের সংসারে তাঁহার একজন ভৃত্য মাত্র, ইহসংসারে মৃত্যুরূপ জবাবপত্র পাইলেই সমস্ত ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। যেন মনে থাকে, ধন-সম্পদের অহঙ্কার, বল-বিক্রমের অহঙ্কার, রূপ-যৌবনের অহঙ্কার, বিদ্যা-বুদ্ধির অহঙ্কার, বা কুল-মানের অহঙ্কার সকলই বৃথা। একদিন সকল অহঙ্কার—অহঙ্কারের অহঙ্কার চূর্ণীকৃত হইবে। যেন মনে থাকে, আজ পার্থিব পদার্থের অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া একজন নিরাশ্রয় দুর্ব্বলকে পদাঘাত করিতেছ, কিন্তু একদিন এমন দিন আসিবে যেদিন শ্মশানে শবাকারে শয়ন করিলে শৃগাল-কুকুরে পদদলিত করিবে, পিশাচ-প্রেত বুকে দাঁড়াইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিবে। সেদিন নীরবে সহ্য করিতে হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিলে ক্রমশঃ পার্থিব পদার্থের অসারতা হৃদয়ঙ্গম হইবে, তখন আসক্তির বন্ধন ঢিলা হইয়া যাইবে। চিত্ত পরিশুদ্ধ হইলে তখন ব্রহ্মচর্য্য-পালন করা সহজ ও সুসাধ্য হইবে। এক্ষণে ***ব্রহ্মচর্য্য*** সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। সাধনার প্রথম প্রয়োজন তত্ত্ব-বিচার।

তত্ত্ব-বিচার

যাঁহার এইরূপ প্রতিজ্ঞা আছে যে, "জীবন যায় যাইবে, তথাপি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া কখনও পশু হইব না, জীবিত থাকিতে কখনই জিতেন্দ্রিয়তা বৃত্তি পরিত্যাগ করিব না"—তিনিই ব্রহ্মচর্য্য পালনে সমর্থ হইয়া থাকেন। ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

"পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদমদিরামুন্মত্তীভূতং জগৎ।"

মোহময়ী প্রমোদরূপ মদ্য পান করিয়া এই অনন্ত জগৎ উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছে। যে কোনও জীব হউক, তাহার পুরুষকে তাহার স্ত্রীজাতি মোহাকর্ষণে টানিয়া রাখিয়াছে।* সকলেই রিপুর উত্তেজনায় অজ্ঞানতার তাড়নায় নরকবহ্নিতে ঝাঁপ দিতেছে। বিদ্যালয়ের বালক হইতে বুড়োমিন্সে পর্য্যন্ত সকলেই ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য শুক্রক্ষয় করিয়া জীবনের সুখ বিনষ্ট করতঃ বজ্রদগ্ধ তরুর ন্যায় বিচরণ করিতেছে। এইরূপ নিকৃষ্ট বৃত্তির অধীন হইলে নরনারীগণের হৃদয়বৃত্তি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, বস্তুগত্যা জ্ঞান থাকে না।

এই আকর্ষণ হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় কি ? অভ্যাস ও সংযমে সকলই হয়। তত্ত্বজ্ঞানে ও সংযম অভ্যাসে ইহা

---

* নরনারীর পরস্পর আকর্ষণের কারণ ও তৎপ্রতিকারের উপায় শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব প্রণীত "জ্ঞানীগুরু" গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। "প্রেমিকগুরু"তে সাধনা লেখা হইয়াছে।—প্রকাশক

হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা করিতে হইবে যে, যাহা নরকের কারণ, রোগের কারণ—সে কার্য্য কেন করিব? যাহার জন্য কর্ত্তব্য-পন্থা হইতে বিচলিত হইতেছি, সে স্ত্রী কি? কি দেখিয়া আমাদের প্রাণভরা পিপাসা, কিসের জন্য এই পাশব বাসনার আগুন? দৈহিক সৌন্দর্য্য? কিন্তু দেহ কি? পঞ্চমহাভূতের সমষ্টি অবস্থা ভিন্ন ত আর কিছুই নহে। যাহার বিকাশ সমস্ত জগৎ জুড়িয়া, যাহা বিশ্বের সমস্ত বস্তুতেই বিদ্যমান, তাহার জন্য একটী সীমাবদ্ধ স্থানে আকর্ষণ কেন? বিশেষতঃ রূপযৌবন কয় মুহূর্ত্তের জন্য? এই দেহ বাল্যকালে কি ছিল—যৌবনে কি হইয়াছে—আবার প্রৌঢ়-বার্দ্ধক্যেই বা কি হইবে—এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল দেহের পরিণাম কি, তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। ঐ যে জীর্ণা শীর্ণা বৃদ্ধা মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া, ঐ বৃদ্ধাও অবশ্য যুবতী ছিল; কিন্তু এখন কি হইয়াছে? আবার যৌবনেও রোগোৎপত্তি হইয়া এই সুন্দর দেহকে পচাইয়া-ধসাইয়া প্রেতের অধম করিয়া দিতে পারে। তাহার জন্য আর আসক্তি কেন?

মৃত রমণীর কঙ্কাল দেখিয়া বিচার করিবে—

"এই নারীর পরিণাম! সেই মুখারবিন্দই বা কোথায়, আর কোথায় বা ঈদৃশী অবস্থা! এই কঙ্কালের মধ্যে তাহার কিছু চিহ্ন দেখিতে পাইতেছ কি? এখন ভাব দেখি, যাহা সুধার ন্যায় সমাদরে পান করিতে, সেই অধরমধু কোথায়? সেই মধুমাখা সুমধুর আলাপই বা কোথায় এবং সেই মদনধনুর বিলাসের ন্যায় ভ্রূভঙ্গীর বিলাসই বা কোথায়? জীব! রাগান্ধ হইয়া চর্ম্মাবৃত এই কঙ্কালকেই কত মধুমাখা দ্রব্য মনে করিয়াছ! অন্ধ, সে সময়ে যদি তোমার এই পরিনাম মনে পড়িত, তাহা হইলে আর ঐরূপ দ্রব্য লইয়া আহ্লাদিত হইতে না।"

নশ্বর শরীরের জঘন্যতা সর্ব্বদা আলোচনা করিলে কামদমনে অনেক সহায়তা পাওয়া যায়। এই যে নবদ্বার-বিশিষ্ট শরীর, ইহা রক্তক্লেদ, মলমূত্র, ফেনাদি দ্বারা দুর্গন্ধীকৃত। ইহাকে সর্ব্বদা পরিষ্কার না করিলে যখন ইহা অতি অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তখন ইহার প্রতি আসক্তি কেন? মহামুনি দত্তাত্রেয় বলিয়াছেন—

বিষ্ঠাদি নরকং ঘোরং ভগং চ পরিনির্ম্মিতম্।
কিমু পশ্যসি রে চিত্ত কথং তত্রৈব ধাবসি॥
ভগাদি কুচপর্য্যন্তং সংবিদ্ধি নরকার্ণবম্।
যে রমন্তি পুনস্তত্র তরন্তি নরকং কথম্॥

—অবধূত-গীতা

অন্যত্র আছে—

অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসংকুলে
স্বভাবদুর্গন্ধিবিনিন্দিতান্তরে।
কলেবরে মূত্রপুরীষভাবিতে
রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ॥

—যোগোপনিষৎ

তুলসীদাস বলিয়াছেন—

জৈসী পুতলী কাঠকী, পুতলী মাসময় নারী।
অস্থি নাড়ী মলমূত্রময়, বস্থিতা নিন্দিতা ভারী॥

এই যে শরীর—দেখিতে কি পাও না—ইহা ব্রণযুক্ত, দুর্গন্ধি-চর্ম্মজড়িত, শত শত কৃমিপূর্ণ, মূত্রবিষ্ঠানুলিপ্ত, ভিন্ন ভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে; যদিও সকল প্রকার ভোগের বাস, কিন্তু মোহ-প্রসক্তি দ্বারা নিশ্চয়ই মরণের কারণ হইয়া রহিয়াছে; ইহাই ক্ষয়ের দ্বার, যদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার যৌবন ও ধন একেবারে সমূলে বিনষ্ট হয়। যাহা কতকগুলি রক্ত, মাংস, ক্লেদ, কঙ্কাল, মল, মূত্র, শ্লেষ্মা ও লালা প্রভৃতির সমষ্টি, তাহাতে যাহার আসক্তি, তাহার রুচি যৎপরোনাস্তি জঘন্য। যে বিষ্ঠার কৃমির ন্যায় ঘৃণিত বিষয়ের মধ্যে সন্তরণ করিতে ভালবাসে, তাহাকে প্রেতপিশাচ ভিন্ন আর কি বলিব?

বিন্দুধারণের উপকারিতা

সর্ব্বদা **বিন্দুধারণের উপকারিতা ও শুক্রক্ষয়ের অপকারিতা** চিন্তা করিবে, যথা—

মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।—শিবসংহিতা

দত্তাত্রেয় বলিতেছেন—

যদি সঙ্গং করোত্যেব বিন্দুস্তস্য বিনশ্যতি।
আত্মক্ষয়ো বিন্দুহানাদসামর্থ্যঞ্চ জায়তে॥

"যদি স্ত্রীসঙ্গ করে, তবে বিন্দুনাশ হয়। বিন্দুনাশ হইলেই আত্মক্ষয় ও সামর্থ্যনাশ হইয়া থাকে।" যিনি যে পরিমাণে বিন্দুরক্ষা করিবেন, তাঁহার সেই পরিমাণে হৃদয়

প্রফুল্ল, মস্তিষ্ক সবল, শরীর শক্তিশালী, মন ও মুখশ্রী স্নিগ্ধ ও সুন্দর হইবে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্ যস্তু স দেবো নতু মানুষঃ।

"যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া ঊর্দ্ধরেতা হইয়াছেন, তিনি মানুষ নামে প্রকৃত দেবতা।" যিনি ঊর্দ্ধরেতা, মৃত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন, বীরত্ব তাঁহার করায়ত্ত। শুক্রের ঊর্দ্ধগমনে অতুল আনন্দ লাভ হয়। পরমযোগী সদাশিব বলিয়াছেন—

সিদ্ধে বিন্দৌ মহাযত্নে কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
যস্য প্রসাদান্মহিমা মমাপ্যেতাদৃশো ভবেৎ॥

—শিবসংহিতা

"যখন বিন্দুধারণ করিবার ক্ষমতা জন্মে, তখন পৃথিবীতলে কি না সিদ্ধ হয়? যাহার প্রভাবে আমার (শিবের) ব্রহ্মাণ্ডোপরি এতাদৃশ মহিমা রহিয়াছে!" অতএব যত্নের সহিত বিন্দুধারণ করিবে। সতত বিন্দুধারণ করিলে যোগিগণের সিদ্ধিলাভ হয়। কেননা বীর্য্য সঞ্চিত হইলে মস্তিষ্কে প্রবল শক্তি সঞ্চারিত হয়। এই মহতী শক্তির বলে একাগ্রতাসাধন সহজ হয়।

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।

—পাতঞ্জল-দর্শন

"ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠা হইলে বীর্য্যলাভ হয়।" অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির দেহে ব্রহ্মণ্যদেবের বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ব্রহ্মচর্য্যহীনের দুর্গতি

ব্রহ্মচর্য্য-অভাবে যে সর্ব্বনাশ ঘটে, বারংবার তাহা মনে করা কর্ত্তব্য। কামেন্দ্রিয়ের অপরিমিত পরিচালন ও তন্নিবন্ধন অধিকতর শুক্রব্যয় করিলে স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হয়, নানা প্রকার উৎকট রোগের উৎপত্তি হয় এবং ক্রমে ক্রমে মনুষ্যকে মনুষ্যত্ববিহীন করে। প্রথমে বালকের যখন অধঃপতন হয় তখন সে সলজ্জ হয়, গুরুজনের মুখের দিকে আর স্পষ্ট চাহিয়া আলাপ করিতে পারে না। ক্রমে শুক্রমেহ রোগের উৎপত্তি হয়। তখন প্রস্রাবের সহিত শুক্র নিঃসৃত হয় এবং স্বপ্নদোষ জন্মে। স্বভাব খিট্‌খিটে হয়, অল্প কারণেই অসন্তোষের উদয় হয়, সাহস কমিয়া ভীরুতা বৃদ্ধি পায়। ক্ষুধা কমিয়া যায়, কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে, কোন ভাল চিন্তা করিতে পারে না—কুচিন্তা আসিয়া মনকে অধিকার করে।

ক্রমে চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণবর্ণ রেখা পড়ে। দাড়ি, গোঁফ ও মাথার চুল পাতলা হয়। মূত্রকৃচ্ছ্রতা জন্মে। দর্শনশক্তি ও শ্রবণশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত ও সন্তান-জননশক্তি বিলুপ্ত হয়, এমন কি পুরুষত্ব লুপ্ত হইয়া যায়। স্ত্রীলোক দর্শন বা স্পর্শন করিলেও শুক্র নির্গত হয়। মূর্চ্ছা বা মৃগী রোগেও অনেকে আক্রান্ত হয়। মূত্রনালীতে জ্বালা, বেদনা ও টাটানি উপস্থিত হয় এবং পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয়। অপরিমিত শুক্রক্ষয়ে মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্কের ক্রিয়া অত্যন্ত

বিকৃত হয়। রোগী স্মৃতিভ্রষ্ট, সর্ব্বদা অন্যমনস্ক ও কখন কখন উন্মাদ দশা প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বদাই বুক ধড়্‌ফড়্‌ করে, সর্ব্বদা কণ্ঠ ও ওষ্ঠ শুষ্ক হয়। হস্ত, পদ, চক্ষু ও ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বালা করে। রোগী যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করে। চিকিৎসাশাস্ত্রে অধিকাংশ রোগের নিদান শুক্রক্ষয় বলিয়া লিখিত আছে। শুক্রক্ষয় যে যাবতীয় রোগের নিদান, শুক্রক্ষয় হইতে যে মনুষ্য মনুষ্যত্ব হারায়, মরণের পথে অগ্রসর হয়, মনুষ্য-নামের বহির্ভূত হইয়া পড়ে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত, চিকিৎসাবিজ্ঞানের সার ও একান্ত সত্যস্বরূপ উপদেশ।

ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে শরীরের যেরূপ দুর্গতি হয়, মনের দুর্গতি তদপেক্ষা অধিক হয়। সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবেশিনী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, উদ্যমশীলতা ও অধ্যবসায়, উচ্চাভিলাষ, ক্ষমা, দয়া, সংযমশক্তি, স্বাধীনতা, উল্লাস, স্ফূর্ত্তি, ধৈর্য্য, বল, উৎসাহ, ঔদার্য্য, ভক্তি প্রভৃতি মনুষ্যোচিত সমস্ত প্রকার গুণই একেবারে লোপ পায়। মানুষের মনুষ্যত্ব হারাইবার—বল, বীর্য্য, আয়ু ও স্বাস্থ্য বিনষ্ট হইবার একমাত্র হেতু শুক্রক্ষয়। এই সকল জানিয়া যাহাতে শুক্র বিনষ্ট না হয়, যাহাতে উহা অবিচলিত ও অটুট থাকে, প্রত্যেক মনুষ্যের তাহা সর্ব্বদা করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ সন্তান-সন্ততিগণের উপর অভিভাবকগণের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। **বালকগণকে কাছছাড়া করা মাতার কর্ত্তব্য নহে**। শিশুর ন্যায় সর্ব্বদা বুকের ভিতরে রাখিতে পারিলে অধিক উপকার দর্শে। তাহারা কিছুই জানে না—

কিছুই বোঝে না—আপাত-সুখের আশায় সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া ফেলে। পুত্রের বয়স নয় বৎসর হইলেই ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। **বালিকাগণকেও এই শিক্ষা দিতে ভুলিবেন না।**

বিশেষ নিয়ম

ব্রহ্মচারী ব্যক্তি উপরোক্তরূপ তত্ত্ববিচার করিবে এবং নিম্নলিখিত নিয়ম কয়টি পালন করিবে।

(১) স্ত্রীলোকের নিকট হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবে। অগ্নিরূপিণী স্ত্রীর নিকট ঘৃতস্বরূপ পুরুষের অবস্থান মঙ্গলকর নহে। মহর্ষি কপিলদেব বলিয়াছেন—

সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ প্রমদাসু যস্তু
যোগস্য পারং পরমারুরুক্ষুঃ।
মৎসেবয়া প্রতিলব্ধাত্মলাভো
বদন্তি যাং নিরয়দ্বারমস্য॥
যোপযাতি শনৈর্মায়া যোষিদ্দেববিনির্ম্মিতা।
তামীক্ষেতাত্মনো মৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্॥
—শ্রীমদ্ভাগবত

"যে ব্যক্তি যোগের পরমপারে যাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি কখনই রমণীর সাহচর্য্য করিবেন না। সিদ্ধ মহাপুরুষেরা বলিয়া থাকেন, নারী নরকের দ্বারস্বরূপ। দেবনির্ম্মিত প্রমদারূপিণী মায়া শুশ্রূষাদি দ্বারা অল্পে অল্পে আনুগত্য করিতে থাকে, কিন্তু জ্ঞানী তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় তাহাকে আপনার মৃত্যু

বলিয়া বিবেচনা করিবে।"* মহাত্মা তুলসীদাস স্ত্রীজাতিকে বাঘিনী বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

দিনকা মোহিনী রাত্‌কা বাঘিনী পলক পলক লহু চুষৈ।
দুনিয়াকা সব বৌরা হো কর ঘর ঘর বাঘিনী পুষৈ॥

অতএব নারীকে বাঘিনী জ্ঞানে দূরে থাকা শ্রেয়ঃ। স্ত্রীলোকের নিকট আবাসস্থান করিবে না, তাহাদের সহিত একত্র বাস করিবে না, গোপনে আলাপ পরিত্যাগ করিবে এবং তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিবে না।

(২) নরনারীর প্রেমঘটিত কোন পুস্তক পাঠ করিবে না। থিয়েটার ও বাইখেমটার নৃত্যগীত দর্শন-শ্রবণ করিবে না। রমণীপ্রসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে, মনেও নারীচিন্তা বা স্মরণ করিবে না।

(৩) দুশ্চিন্তা মনে স্থান দিও না। ইন্দ্রিয়ের বিষয় চিন্তা করিলে আর পাপের বাকী রহিল কি? সর্ব্বদা কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। **অলস ও অতিরিক্তাহারী ব্যক্তিগণই ইন্দ্রিয়লালসা হইতে কষ্ট পায়।** কোন কার্য্য না থাকিলে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিও। কুচিন্তা উদয়মাত্র মনকে প্রত্যাহৃত করিবে। তখন উচ্চৈঃস্বরে নামজপ কিম্বা ভগবদ্বিষয়ক গান করিলে উপকার হইবে।

---

* ব্রহ্মচারিণীগণও পুরুষগণকে এইরূপ ভাবিবে।—লেখক

(৪) রাত্রি অধিক না হইতে নিদ্রা যাইবে ও অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিবে। শয়ন করিবার পূর্ব্বে হস্তপদাদি শীতল জল দ্বারা ধুইয়া পরিষ্কার বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক শয্যায় শয়ন করিবে। **একাকী শয়ন করা কর্ত্তব্য।** শুইয়া যতক্ষণ নিদ্রা না আসে ততক্ষণ ভগবানকে চিন্তা করিবে। নিদ্রার পূর্ব্বে এবং গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে প্রভূত পরিমাণে শীতল জল পান করিবে। শয়নগৃহে যাহাতে বায়ু চলাচল করিতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখিবে। রাত্রিজাগরণ বিশেষ অপকারী জানিবে।

(৫) **যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এবং নিম্ন উদরে বায়ু জমিতে না পারে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।** উত্তেজক এবং গুরুপাক দ্রব্য মুখেও দিবে না। আহারের ব্যবস্থা প্রথম অধ্যায়ে লেখা হইয়াছে।

(৬) **শারীরিক পরিশ্রম ইন্দ্রিয়জয়ের পক্ষে উপকারী।** প্রত্যহ কোনরূপ ব্যায়াম কিম্বা মুক্ত বাতাসে দ্রুতপদে ভ্রমণ করিবে।

(৭) নিজেকে সর্ব্বদা পবিত্র রাখিলে পাপের প্রতি ঘৃণা হইবে, "এই শরীর ভগবানের মন্দির"—সর্ব্বদা এই চিন্তা করিলে হৃদয়ে পাপ প্রবেশ করিতে পারিবে না।

(৮) সৎসঙ্গলাভের চেষ্টা করিবে। মহতের কৃপায় জগাই-মাধাই প্রভৃতি মহাপাপীও কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে। **কুসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য।** কুগ্রন্থ অধ্যয়ন, কুচিত্র দর্শন, কুবাক্য

কি কুসঙ্গীত শ্রবণ—সমস্তই কুসঙ্গের মধ্যে পরিগণিত; এমন কি মৈথুনীভূত ইতর প্রাণী পর্য্যন্ত দেখা কর্ত্তব্য নহে।

(৯) **কোমল শয্যায় (তুলার গদি ইত্যাদিতে) শয়ন করিবে না।** কঠিন শয্যা ও কঠিন উপাধান উপকারী। সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিবে।

(১০) **ভগবানের মাতৃমূর্ত্তিচিন্তা ব্রহ্মচর্য্যপালনের বিশেষ সহায়ক।** কামের বিপরীত বৃত্তি ভক্তি; যতই ভক্তির অনুশীলন করিবে, ততই কুপ্রবৃত্তি দূরে পলায়ন করিবে। তুলসীদাস বলিয়াছেন, "জহাঁ রাম উহাঁ নহী কাম"—যেখানে ভক্তি আছে, সেখানে কামের অধিকার নাই। এজন্য সর্ব্বদা ভক্তির উৎকর্ষ সাধন করিবে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় গুরুজনকে প্রণাম করিবে এবং নিকটে দেবালয় থাকিলে সেখানে যাইয়া প্রণাম করিয়া আসিবে। আপন জননীকে প্রণাম করিলেও বিশেষ উপকার হয়। এ জগতে মা'র মত মধুর ও পবিত্র সামগ্রী কিছুই নাই। মা শব্দই পবিত্রতার আধার, মা বলিতেই যেন হৃদয় পবিত্র ভাবে পূর্ণ হয়। এইজন্য ভগবান্‌কে মা বলিয়া ডাকিতে যত আনন্দ হয়, তত আনন্দ আর কোন নামেই পাওয়া যায় না। যাহার প্রাণে ভগবানের মাতৃভাব সর্ব্বদা জাগরূক থাকে, তাহার প্রাণ সর্ব্বদা সরস থাকে, অথচ কোনরূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত হইবার আশঙ্কা থাকে না। **নারীমাত্রেই ভগবানের মাতৃভাবের বিকাশ, সুতরাং স্ত্রীলোকমাত্রেই মাতৃস্বরূপা;** এইরূপ জ্ঞান

যাহার হয়, স্ত্রীলোক দেখিলেই যাহার চিত্ত পবিত্রতায় পরিপ্লুত হইয়া পড়ে, তাহার হৃদয়ে আর অপবিত্র ভাব স্থান পাইবে কিরূপে? জগন্ময় চারিদিকে মাতৃভাবের উন্মেষ হইলে সমস্ত পৃথিবী পবিত্রতামাখা বলিয়া প্রতিভাত হয়। অতএব স্ত্রীলোক দেখিবামাত্র স্বীয় মাতাকে মনে করিবে, তাহা হইলে কাম-কুক্কুর আর তোমার ত্রিসীমানায় পঁহুছিতে পারিবে না। কামদমনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় ভগবানে প্রীতি স্থাপন করা। একবার সেই প্রেমময়ের পবিত্র প্রেমে মজিতে পারিলে আর কামকলুষিত কুৎসিত প্রেম চিত্তকে প্রলুব্ধ করিতে পারিবে না।

এ পর্য্যন্ত যতগুলি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইল, মনে ভাল হইবার ইচ্ছা না থাকিলে ইহার কোনটাই কার্য্যকরী হইবে না। পবিত্র হইবার ইচ্ছা লইয়া এই নিয়মানুসারে চলিলে আশাতীত ফল পাইবে। অতিশয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দ্বারা নিজের মানসিক ও নৈতিক স্বভাবকে নিয়মিত করিতে চেষ্টা করিবে।

গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্য

অবিবাহিত বা কুমার ব্রহ্মচারী ব্যতীত অন্য গৃহস্থ ব্যক্তিও সত্যবাদী ও জ্ঞাননিষ্ঠ হইলে এবং ঋতুকাল ব্যতীত অন্য সময়ে স্ত্রীগমন না করিলে ব্রহ্মচারিরূপে গণ্য হইতে পারেন। যথা—

ভার্য্যাং গচ্ছন্ ব্রহ্মচারী ঋতৌ ভবতি বৈ দ্বিজঃ।

—মহাভারত

বিবাহিত ব্যক্তিরও ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে স্ত্রীগমন কর্ত্তব্য নহে। **দৈহিক গঠন সম্পূর্ণ, বীর্য্য পক্ক ও শরীর নীরোগ না থাকিলে সন্তানজনন উচিত নহে।** গৃহস্থ ব্যক্তি পুত্রকামনায়, বংশরক্ষার্থে, ভগবানের সৃষ্টিপ্রবাহ বজায় রাখিবার জন্য সংযতচিত্তে প্রত্যেক মাসে একদিন স্বীয় স্ত্রীর ঋতু রক্ষা করিবেন।

অনেকে মনে করিতে পারেন, সকলে জিতেন্দ্রিয় হইলে সংসার চলিবে কিরূপে? ইহার উত্তরে হিন্দুশাস্ত্র বলেন, জিতেন্দ্রিয় হইয়া তবে বিবাহ করিও—গৃহস্থ হইও। পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, পরে গার্হস্থ্যাশ্রম। শৈশবের পরেই ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা ইন্দ্রিয় দমিত, চিত্ত শমিত এবং হৃদয় পবিত্র হইলে, যিনি গৃহস্থ হইতে ইচ্ছুক, তিনি আপনার সদৃশী ভার্য্যা গ্রহণ করিবেন। হিন্দুশাস্ত্রের অমূল্য উপদেশ—বিষয়-বাসনা দগ্ধ করিয়া তবে বিষয়ভোগ এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া তবে স্ত্রীগ্রহণ। ছাগ-ছাগীর মত জীবন যাপন করিবার জন্য আর্য্য-ঋষিগণ গার্হস্থ্যাশ্রমের ব্যবস্থা করেন নাই। সন্তানোৎপাদনে যে ভয়ানক দায়িত্ব, অজিতেন্দ্রিয় অবস্থায় সেই গুরুতর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়া কি সর্ব্বনাশের কারণ নহে? যে জিতেন্দ্রিয় নয়, তাহাতে আর পশুতে প্রভেদ কি? তাই গৃহস্থ আজ পশুর ন্যায় নারীতে আসক্ত; তাই তাহাদের

উৎপাদিত সন্তানগণ পাশব প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করতঃ দেশে পাপস্রোত বৃদ্ধি করিতেছে। গৃহস্থের পবিত্র দাম্পত্য-জীবন ধর্ম্মময়—প্রেমময়—আনন্দময়!

এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্যসাধনের সহায়স্বরূপ কয়েকটী শারীরিক ক্রিয়ার বিষয় বিবৃত করিয়া আমরা এ বিষয়ের উপসংহার করিব।

যোগশাস্ত্রানুযায়ী আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়াম জিতেন্দ্রিয়ত্ব সাধনের বিশেষ পন্থা। প্রাণায়ামাদি মনকে স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে একাগ্র করিয়া দেয়, সুতরাং তাহারা নিকৃষ্ট রিপু-উত্তেজনার ঘোর শত্রু।

আসন-সাধন

শরীর কম্পিত না হয়, বেদনাপ্রাপ্ত না হয়, চিত্তের কোন প্রকার উদ্বেগ না জন্মে বা চিত্ত চঞ্চল না হয়—এই প্রকার স্থিরভাবে সুখে উপবেশন করার নাম আসন। যোগ-শাস্ত্রে চৌরাশী প্রকার আসনের উল্লেখ আছে। উহার মধ্যে যেগুলির অভ্যাসে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার পক্ষে সহায়তা হয়, তাহারই কয়েকটী নিম্নে লিখিত হইল।

বাম উরুর উপরে দক্ষিণ চরণ এবং দক্ষিণ উরুর উপরে বাম চরণ সংস্থাপন করিয়া উভয় হস্ত পৃষ্ঠদিকে নিয়া বাম হস্ত দ্বারা বাম পদাঙ্গুষ্ঠ এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবে। তালুমূলে জিহ্বাগ্রভাগ

এবং হৃদ্দেশে চিবুক সংস্থাপন করিয়া নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক উপবেশন করিবে। ইহার নাম **পদ্মাসন**। পদ্মাসন দুই প্রকার, যথা—মুক্ত ও বদ্ধ পদ্মাসন। প্রোক্ত নিয়মে উপবেশন করাকে বদ্ধ পদ্মাসন বলে। আর হস্ত দ্বারা পৃষ্ঠদিক্ নিয়া পদাঙ্গুষ্ঠ না ধরিয়া উরু-দুইটির উপর হস্ত চিৎ করিয়া উপবেশনের নাম মুক্ত পদ্মাসন। পদ্মাসন করিলে নিদ্রা, আলস্য ও জড়তা প্রভৃতি দেহের গ্লানি দূরীভূত এবং সর্ব্বব্যাধি বিনষ্ট হয়।

এক পায়ের গোড়ালী (গুড়মুড়া) দ্বারা গুহ্যদ্বারের উপর চাপিয়া রাখিবে এবং অন্য পায়ের গোড়ালীর দ্বারা জননেন্দ্রিয়ের উপর ঠিক গোড়ায় চাপিয়া রাখিবে। অতঃপর হৃদয়ে চিবুক বিন্যস্ত করিয়া দেহটিকে সরলভাবে সংস্থাপনপূর্ব্বক ভ্রূদ্বয়ের মধ্যদেশে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া অর্থাৎ শিবনেত্র হইয়া উপবেশন করিবে। ইহার নাম **সিদ্ধাসন**। সিদ্ধাসনের দ্বারা স্নায়ুর বিকাশ ও সমস্ত শরীরে তড়িৎশক্তি চলাচলের সুবিধা হয়।

উভয় চরণ প্রসারিত করিয়া পরস্পর অসংযুক্ত ভাবে রাখিবে। তৎপরে উভয় হস্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে উভয় পদ ধারণ করিয়া জানুর উপরে নিজের মস্তক স্থাপন করিবে। উপুড় হইয়া ইহার সাধন করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম **পশ্চিমোত্তান**। বায়ু-উদ্দীপক বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে **উগ্রাসন**ও বলে।

উভয় গুল্ফ (গুড়মুড়া) অণ্ডকোষের নিম্নে পরস্পর উল্টা করিয়া পশ্চাদ্দিকে ঊর্দ্ধভাগে বহিষ্কৃত করিবে এবং উভয় জানু ভূমিতে সংস্থাপন করিয়া ঐ জানুর উপরে মুখ অপ্রকাশিতরূপে উন্নত করিয়া স্থাপন-পূর্ব্বক জালন্ধরবন্ধ অবলম্বন (তালুমূলে জিহ্বাগ্রভাগ সংস্থাপন) করিয়া নাসার অগ্রভাগ নিরীক্ষণ করিবে। ইহা নাম **সিংহাসন**।

ব্রহ্মচারিগণের পক্ষে এই চারি প্রকার আসনের অনুষ্ঠান মঙ্গলজনক। উহার মধ্যে যে কোনও একটী আসন অভ্যাস করিলেই চলিবে। তবে দুই বা ততোধিক আসন অভ্যাস করিতে পারিলে ক্ষতি নাই। দুই হাত দীর্ঘ দেড় হাত প্রস্থ কোন আসনের উপর উপবেশন করিয়া আসন অভ্যাস করিবে। ব্রহ্মচারীর পক্ষে কুশাসনই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আসনে বসিয়া উচ্চতর চিন্তা ও প্রাণায়ামাদি মহত্তর কার্য্য সাধন করিবে। আসন অভ্যাসের সময় প্রথমতঃ একটু অসুবিধা ও কষ্ট অনুভব হয় বটে, কিন্তু অভ্যাস হইয়া গেলে ইহা দ্বারা আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। আসন অভ্যাস করিলে যখন সুখজনক ভাব আসিবে, তখনই তাহা উপকারী হইবে —নতুবা নহে।

ততো দ্বন্দ্বোঽনভিঘাতঃ।—পাতঞ্জল-দর্শন

আসন জয় হইলে, শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতি যুগ্ম পদার্থের দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না। আসন সিদ্ধ হইলে তখন এমন এক সহ্যশক্তি জন্মিয়া থাকে যে তাহা অন্য কোন প্রকারে জন্মিতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে আসন বিশেষ প্রয়োজনীয়।

প্রাণায়াম-সাধন

উত্তমরূপে আসন অভ্যাস হইলে প্রাণায়াম করিতে হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া কৌশলে

বিধৃত করার নাম **প্রাণায়াম**। প্রাণায়াম বলিলে সাধারণতঃ রেচক, পূরক ও কুম্ভক—এই ত্রিবিধ ক্রিয়াই বুঝিতে হইবে। বহিঃস্থ বায়ু আকর্ষণ করিয়া আভ্যন্তর অংশ পূরণ করাকে পূরক, জলপূর্ণ কুম্ভের ন্যায় অভ্যন্তরে বায়ু ধারণ করাকে কুম্ভক এবং ধৃত বায়ুকে বাহিরে নিঃসরণ করাকে রেচক বলে।

উত্তর কিম্বা পূর্ব্বমুখে কুশাসনোপরি আপন আপন অভ্যস্ত আসনে উপবেশনপূর্ব্বক মেরুদণ্ড, ঘাড় ও মস্তক সোজাভাবে রাখিয়া ভ্রূর মাঝারে দৃষ্টি স্থির করিতে হয়। প্রথমে হস্তের দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধারণ করতঃ বায়ুরোধ করিয়া প্রণব (ওঁ) বা আপনার ইষ্টমন্ত্র ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বাম নাসাপুটে বায়ু পূরণ করিবে; তৎপর কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা বাম নাসাপুট ধারণপূর্ব্বক বায়ুরোধ করতঃ ওঁ বা মূলমন্ত্র চৌষট্টিবার জপ করিতে করিতে কুম্ভক করিবে; তৎপরে দক্ষিণ নাসাপুট হইতে অঙ্গুষ্ঠ তুলিয়া বত্রিশবার ওঁ বা মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসাপুট দিয়া বায়ু রেচন করিবে। এইভাবে পুনরায় বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ শ্বাসত্যাগের পর ঐ দক্ষিণ নাসিকা দ্বারাই ওঁ বা মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে পূরক, উভয় নাসাপুট ধরিয়া কুম্ভক এবং বাম নাসায় রেচক করিবে। অতঃপর পুনরায় অবিকল প্রথম বারের ন্যায় নাসা ধারণ, ক্রমানুসারে পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিবে। প্রথম অভ্যাসকালে ১৬।৬৪।৩২ সংখ্যায় প্রাণায়াম করিতে কষ্ট হইলে, ৮।৩২।১৬ অথবা ৪।১৬।৮ বার জপ করিতে করিতে প্রাণায়াম করিবে। বাম হস্তের কররেখায় জপের সংখ্যা রাখিবে।

যাহাদের মন্ত্রজপের সুবিধা নাই (মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি), তাহারা এক, দুই—এইরূপ সংখ্যার দ্বারাই প্রাণায়াম করিবে; নতুবা ফল পাইবে

না। কেননা তালে-তালে শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। আর সাবধান!—যেন সবেগে রেচক বা পূরক না হয়। রেচকের সময় বিশেষ সতর্ক ও সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ অল্পবেগে শ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে যে হস্তস্থিত শক্তু (ছাতু, বার্লি) যেন নিশ্বাসের বেগে উড়িয়া না যায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় প্রবাহিত হয়। বায়ুর ব্যতিক্রম হইলে নানা প্রকার রোগ হইবার সম্ভাবনা।

প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় এবং মধ্যরাত্রিতে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়। ময়লা ও আবর্জ্জনাদিপূর্ণ স্থানে, দূষিত বায়ুতে, বৃক্ষতলে, কেরোসিন তৈলের আলোযুক্ত গৃহে, মলমূত্রের বেগ ধারণ করিয়া, ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় ও ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইলে প্রাণায়াম করা কর্ত্তব্য নহে। প্রাণায়ামের ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষা করিবার সুন্দর উপায় আর নাই। যখনই কোন কুচিন্তা মনে উদয় হয় বা কুদৃশ্যে মন ধাবিত হয়, তখনই পূর্ব্বোক্ত যে কোন আসনে বসিয়া প্রাণায়াম করিলে প্রত্যক্ষ ফল পাইবে। প্রাণায়াম করিলে প্রথমেই অত্যন্ত শান্তিলাভ করিবে। তারপরে ক্রমশঃ আরও অভ্যাসে মুখের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিবে। শুষ্ক দাগ, চিন্তার রেখা দূর হইবে, গলার স্বর সুমিষ্ট হইবে, যৌবনের নবীন কিরণ দেখা দিবে, সুখের চিরবসন্ত আসিয়া হৃদয় অধিকার করিবে।*

* নাড়ীশোধন করিয়া প্রাণায়াম করা কর্ত্তব্য। কেবল রেচক ও পূরক দ্বারা প্রথমে নাড়ীশোধন করিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়। "যোগী-গুরু" পুস্তকে নাড়ীশোধনের প্রক্রিয়া সম্যক্‌রূপে লিখিত হইয়াছে।

মুদ্রা-সাধন

ব্রহ্মচারীর পক্ষে মুদ্রাসাধন অতিশয় হিতকর। বায়ু প্রভৃতিকে শরীরের সঙ্কোচন-বিকোচন দ্বারা ইচ্ছামত পরিচালনা করাকে **মুদ্রা** বলে।

বাম পায়ের গোড়ালী দ্বারা যোনিদেশ (গুহ্যদেশের উপর) দৃঢ়ভাবে চাপিয়া দক্ষিণ পদ ঠিক সোজা ও সরল ভাবে ছড়াইয়া বসিবে, তৎপরে ঐ দক্ষিণপদ দুই হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিবে এবং কণ্ঠে চিবুক (থুতি) স্থাপিত করিয়া কুম্ভক দ্বারা বায়ু রোধ করিবে। পরে প্রাণায়ামের প্রণালীক্রমে ধীরে ধীরে ঐ বায়ু রেচন করিবে। এই ক্রিয়ার নাম **মহামুদ্রা**।

গোপনীয় গৃহমধ্যে বিতস্তিপ্রমাণ দীর্ঘ, চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত, কোমল, শ্বেতবর্ণ, সূক্ষ্মবস্ত্র দ্বারা নাভিদেশ বেষ্টন করিয়া কোমরের সূত্র (ডোর) দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। পরে ভস্ম দ্বারা গাত্র লেপন করতঃ সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া উভয় নাসাপুট দ্বারা প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করিয়া বলপূর্ব্বক অপান বায়ুতে যুক্ত করিবে এবং যে পর্য্যন্ত সুষুম্নাবিবরে বায়ু গমন করিয়া প্রকাশিত না হয়, সে পর্য্যন্ত অশ্বিনীমুদ্রা দ্বারা গুহ্যদেশকে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিতে হইবে। এই ক্রিয়ার অভ্যাসে কুল-কুণ্ডলিনীশক্তি উদ্বোধিতা হয় বলিয়া, ইহার নাম **শক্তিচালনী মুদ্রা**।

প্রথমে পূরকযোগ দ্বারা স্বীয় মূলাধারপদ্মে বায়ুর সহিত মনকে স্থাপিত করিবে। গুহ্যদ্বার ও উপস্থের পরবর্ত্তী স্থানকে যোনিমণ্ডল বলে। এই যোনিস্থান আকুঞ্চিত করিয়া কুম্ভক করিবে। যথাসাধ্য কুম্ভক করিয়া ধীরে ধীরে বায়ু রেচন করিবে। প্রাণায়াম-মাত্রা-যোগেই ইহা করিতে হয়। এই মুদ্রাকে **যোনিমুদ্রা** বলে।

নাভির ঊর্দ্ধভাগ ও অধোভাগ পশ্চিমোত্তান করিবে। অর্থাৎ নাভি-স্থান সঙ্কুচিত করিয়া প্রায় মেরুদণ্ড স্পৃষ্ট করিবে। এই ক্রিয়া অভ্যাসের নাম **উড্ডীনবন্ধ মুদ্রা**। অন্য প্রকার যথা—কুম্ভক দ্বারা নাভির অধঃস্থিত অপান বায়ুকে নাভিদেশের ঊর্দ্ধভাগে উত্তোলনপূর্ব্বক স্থাপন।

আপন আপন অভ্যস্ত আসনে উপবেশন করিয়া মূলাধার সঙ্কোচ পূর্ব্বক অপান বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া প্রাণবায়ুর সহিত ঐক্য করিয়া কুম্ভক করিবে। ইহাকে **মূলবন্ধ মুদ্রা** বলে।

জিহ্বাকে ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধদিকে উল্টাইয়া কপালকুহরে প্রবিষ্ট করাইবে। পরে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে দৃষ্টি স্থির করিলে **খেচরী মুদ্রা** হইবে।

সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্বয়, তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা চক্ষুর্দ্বয়, মধ্যমাদ্বয় দ্বারা মুখবিবর রোধ করিবে। পরে ঠোঁট দু'খানি কাকচঞ্চুর ন্যায় সরু করিয়া বাহ্যবায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক কুম্ভক করিবে। অনন্তর নাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু রেচন করিবে। নদী-মধ্যে কণ্ঠ পর্য্যন্ত জলে নিমগ্ন করিয়াও এই মুদ্রা সাধন করা যায়। ইহার নাম **কাকী মুদ্রা**।

উদরের পার্শ্বদ্বয়ে হস্তদ্বয় স্থাপিত করিয়া পূরকযোগে প্রাণ ও অপান বায়ুকে নাভিস্থানে ধারণ করিয়া কুম্ভক করিবে এবং উদরপার্শ্বে ঐ হস্তমধ্য দ্বারা অল্পে অল্পে চাপ দিতে থাকিবে। এই ক্রিয়াকে **মহামেঘ মুদ্রা** বলে।

স্থিরভাবে সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধাতু কিম্বা প্রস্তরনির্ম্মিত কোন সূক্ষ্ম দ্রব্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়া নির্নিমেষ-নয়নে চাহিয়া থাকিবে। ঐরূপ চাহিয়া থাকিবার সময় শরীর না নড়ে। এইরূপ যতক্ষণ চক্ষু দিয়া জল না পড়ে, ততক্ষণ চাহিয়া থাকিবে। কিম্বা মস্তক, গ্রীবা, পৃষ্ঠ ও উদর সমভাবে রাখিয়া স্বীয় শরীরকে সোজা করিয়া বসিবে। পরে নিমেষোন্মেষ

বর্জ্জন করিয়া নাভিমণ্ডলে দৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক অল্পে অল্পে বায়ু ধারণ করিবে। এই ক্রিয়া-সাধনে **মনের একাগ্রতা** সাধিত হয়।*

এই মুদ্রাগুলির মধ্যে এক-একজন দুই-তিনটী অভ্যাস করিলেই চলিবে। সকলগুলি অভ্যাসের প্রয়োজন নাই। এক-একটী মুদ্রা ছয় মাসের মধ্যেই অভ্যাস হইতে পারে। মুদ্রা শারীরিক ব্যায়ামের অনুরূপ। মুদ্রা অভ্যাসের দ্বারা শুক্রধাতুকে সম্যক্‌প্রকারে রক্ষা করা যায়। ইহা দ্বারা বীর্য্য-স্তম্ভন হয়। মুদ্রা-সাধনের কৌশলে উপস্থ-পর্ব্ব হইতে শুক্র ধাতু মেরুদণ্ডের পথ দিয়া ঊর্দ্ধগামী হয়। ইহার অভ্যাসে হৃতশুক্র ব্যক্তি অল্পদিনের মধ্যে পুনঃ স্বাস্থ্য ও বল প্রাপ্ত হয় এবং অধিকাংশ রোগ মুদ্রা-সাধনে আরোগ্য হইয়া থাকে। সেইজন্যই ব্রহ্মচারীর পক্ষে মুদ্রাসাধন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়।

আসন, প্রাণায়াম ও মুদ্রাসাধন দ্বারা কি উপকার হয়, তাহা কিছুদিন অভ্যাস করিলেই বুঝিতে পারিবে। তবে কেন হয়, তাহার যুক্তিপ্রমাণ প্রদর্শন করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অসম্ভব। সারস্বত মঠ হইতে প্রকাশিত **যোগীগুরু** ও **জ্ঞানীগুরু** পুস্তকে নানাবিধ প্রাণায়াম এবং আরও উচ্চাঙ্গের সাধনা, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান প্রভৃতি যুক্তির সহিত প্রকাশিত

---

* এই ক্রিয়াগুলি অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শিক্ষা করিতে হয়। আমরাও শিক্ষা দিতে পারি।

হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহার পুনরালোচনার স্থানাভাব। প্রয়োজন হইলে উক্ত পুস্তকদ্বয় দেখিয়া লইবে।

উপসংহার

এক্ষণে যুবকগণ! আর্য্যঋষিগণের যুগযুগান্তরের আবিষ্কৃত ও তপঃপ্রভাবে বিজ্ঞাত এবং লোকহিতার্থে প্রচারিত **ব্রহ্মচর্য্য** পালন করিয়া মরজগতে অমরত্ব লাভ কর। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া বল, বীর্য্য, মেধা, আয়ু ও স্বাস্থ্য লাভ করতঃ নিজের ও সমাজের মহদুপকার সাধন কর। কেহ সমগ্র নিয়মগুলি পালন করিতে না পারিলেও যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে ঔদাস্য করিও না। যে যতদূর পালন করিবে, সে অবশ্য সেই পরিমাণ ফল নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। আর **প্রকৃত ব্রহ্মচারী কেবলমাত্র ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিলে সময়ে ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী হইবে।** ব্রহ্মচর্য্যকে ভিত্তি না করিয়া ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর মাত্র।

দেশের একমাত্র আশাভরসাস্থল পবিত্রহৃদয় বালকগণ! তোমরা ব্রহ্মচর্য্য পালন কর—ব্রহ্মচারী হও—শাস্ত্রের আদেশ মান্য করিয়া ব্রত রক্ষা কর—দেখিবে, আবার সেই আয়ু, সেই বল, সেই স্বাস্থ্য, সেই আনন্দ, সেই জীবন আগমন করিবে। আবার ঘরে ঘরে ব্যাস, বাল্মীকি, পতঞ্জলি, গর্গ, জৈমিনি জন্মগ্রহণ করিবেন।

ব্রহ্মচর্য্য-সাধন

—∘:∗:∘—

স্বাস্থ্যরক্ষা-বিধি

—:∘:—

দিনচর্য্যা

কুমার ব্রহ্মচারিগণ ব্যতীত যে সকল যুবক ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম পালন বা সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিতে সক্ষম হইবে না, তাহাদের জন্য হিন্দুচিকিৎসাশাস্ত্র সুশ্রুত-সংহিতা হইতে স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ বিধিগুলি নিম্নে বিবৃত করিলাম। এই অধ্যায়োক্ত যাবতীয় নিয়ম, সদ্বৃত্তি এবং ঋতুচর্য্যা প্রভৃতির যথাযথ আচরণ করিলে মানবগণ অনিয়মজনিত ও ঋতুজনিত উৎকট ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া সুস্থ দেহে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে।

প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া মল মূত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে। তৎপরে দন্তধাবন কর্ত্তব্য। কষায়, মধুর, তিক্ত ও কটুরসের মধ্যে যে রস যে ঋতুতে উপযোগী, সেই রসবিশিষ্ট কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন প্রশস্ত। **দন্তকাষ্ঠ** দ্বাদশাঙ্গুল দীর্ঘ, কনিষ্ঠাঙ্গুলির ন্যায় স্থূল, সরল, গ্রন্থিশূন্য, নূতন, অক্ষত ও

প্রশস্তভূমিজাত ও প্রত্যগ্র হওয়া আবশ্যক। ত্রিকটু (শুঁট, পিপুল ও গোলমরিচ), ত্রিসুগন্ধি (এলাচ, তেজপত্র ও দারুচিনি) ও গজপিপুলের চূর্ণ—মধু, সৈন্ধব ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দন্তকাষ্ঠের কূর্চ্চ দ্বারা তাহা দন্তে ঘর্ষণ করিলে মুখের দুর্গন্ধ, মল ও শ্লেষ্মা দূরীভূত হইয়া মুখের বিশুদ্ধতা, অন্নে রুচি ও মনের প্রসন্নতা জন্মে। গল, তালু, ওষ্ঠ ও জিহ্বারোগে, শ্বাস, কাস, হিক্কা, বমিরোগে এবং দুর্ব্বল, অজীর্ণরোগী, মূর্চ্ছাগ্রস্ত, শিরোরোগী, তৃষ্ণার্ত্ত, শ্রান্ত, মদ্যপানক্লান্ত, কর্ণরোগী ও দন্তরোগীর দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করা উচিত নহে। দন্তধাবনের পর জিহ্বা পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। স্বর্ণ, রৌপ্য বা কাষ্ঠনির্ম্মিত, দশ অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং মৃদু মসৃণ জিভছোলা দ্বারা জিহ্বা পরিষ্কার করা উচিত। জিহ্বা পরিষ্কার করিলে মুখের বিরসতা, দুর্গন্ধ, শোথ ও জড়তা বিনষ্ট হয়। তৎপরে মুখে তৈলাদি স্নেহপদার্থের গণ্ডূষ ধারণ করিতে হইবে। তাহাতে দন্তের দৃঢ়তা ও অন্নে রুচি জন্মে।

মুখ প্রক্ষালনের পর নেত্রে **অঞ্জন** প্রদান কর্ত্তব্য। অঞ্জনকার্য্যে সিন্ধুনদজাত নির্ম্মল স্রোতোঞ্জন প্রশস্ত। তাহার দ্বারা নেত্রের দাহ, কণ্ডু, মল, দৃষ্টিমণ্ডলের ক্লেদ ও বেদনা নষ্ট হয়, নেত্রে শীতাতপ সহ্য হয় এবং নেত্রে কোনরূপ রোগ জন্মিতে পারে না। কিন্তু ভোজনের পরে, মস্তক ধৌত করিয়া, শ্রান্ত হইয়া, রাত্রি জাগরণ করিয়া এবং জ্বর হইলে অঞ্জন দেওয়া উচিত নহে।

অতঃপর **ব্যায়াম** করা আবশ্যক। ব্যায়ামের দ্বারা শরীরের পুষ্টি ও কান্তি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুগঠন, অগ্নির দীপ্তি, আলস্য নাশ, দেহের দৃঢ়তা ও লঘুতা এবং শ্রান্তি, ক্লান্তি ও স্থূলতা বিনষ্ট হয়। বয়স, বল, শরীর, দেশ, কাল ও আহার—এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া অর্দ্ধশ্রান্তি পর্য্যন্ত ব্যায়াম করা উচিত। অতিরিক্ত ব্যায়াম করিলে ক্ষয়, অরুচি, বমি, রক্তপিত্ত, ভ্রম, ক্লান্তি, কাস, শোষ, জ্বর ও শ্বাসরোগ উৎপন্ন হয়। রক্তপিত্ত, শোষ, কাস ও ক্ষতরোগার্ত্ত ব্যক্তি, কৃশ ব্যক্তি, স্ত্রীসঙ্গমে ক্ষীণ ব্যক্তি এবং ভ্রমণার্ত্ত ব্যক্তি ব্যায়াম পরিত্যাগ করিবে। ভোজনের পরে ব্যায়াম করা অনুচিত। ব্যায়ামের পরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মর্দ্দন ও গন্ধদ্রব্য লেপনাদির দ্বারা বায়ু কফ ও মেদের নাশ হয়, অঙ্গ দৃঢ় হয় এবং ত্বক্ নির্ম্মল হয়।

স্নানের পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গে **তৈলাভ্যঙ্গ** কর্ত্তব্য। মস্তকে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে শিরোরোগ নষ্ট হয়; কেশ কোমল, দীর্ঘ, ঘন, স্নিগ্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়; মস্তক সন্তর্পিত হয়; ইন্দ্রিয়সকল প্রসন্ন হয় এবং শূন্যপ্রায় মস্তকের পূরণ হইয়া থাকে। সর্ব্বশরীরে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে দেহ কোমল হয়, বায়ু ও কফের সমতা হয়, ধাতুসমূহের পুষ্টি হয় এবং ত্বকের চিক্কণতা, বল ও বর্ণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পদতলে অভ্যঙ্গ করিলে নিদ্রা, চক্ষুর উপকার, শ্রান্তি ও জড়ত্বের নাশ এবং পদচর্ম্ম মৃদু হয়। তৈল দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে হনু, মস্তক ও কর্ণের বেদনা নিবারিত হয়। কিন্তু তরুণ জ্বরে, অজীর্ণ এবং বমন

বিরেচনের পরে সেই দিনেই তৈলাভ্যঙ্গ করিলে বিবিধ অনিষ্ট হইয়া থাকে।

অভ্যঙ্গের পর **স্নান** করিতে হয়। স্নান করিলে চিত্ত প্রফুল্ল হয়, মলনাশ হয়, ইন্দ্রিয়সমূহ বিশোধিত হয়, রক্ত পরিস্কৃত হয়, জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হয়, তন্দ্রা নষ্ট হয় এবং পাপ দূরীভূত হয়। শীতকালে উষ্ণজলে ও উষ্ণকালে শীতল জলে স্নান বিধেয়; যেহেতু শীতকালে শীতল জলে স্নান করিলে শ্লেষ্মা ও বায়ুর প্রকোপ এবং উষ্ণকালে উষ্ণজলে স্নান করিলে পিত্ত ও রসের প্রকোপ হইয়া থাকে। কিন্তু উষ্ণজলে শিরঃ-স্নান চক্ষুর অনিষ্টকর; তবে শ্লেষ্মা ও বায়ুর প্রকোপে ব্যাধির বলাবল বিবেচনা করিয়া উষ্ণজলে শিরঃস্নান করা যাইতে পারে। অতিসার, জ্বর, কর্ণশূল, বায়ুরোগ, আধ্মান, অরুচি ও অজীর্ণরোগে এবং ভোজনের পর স্নান করা উচিত নহে।

স্নানের পর গাত্রে চন্দনাদি অনুলেপন; পুষ্প, বস্ত্র ও রত্ন ধারণ এবং কেশ প্রসাধন কর্ত্তব্য। গাত্রে চন্দনাদি অনুলেপন করিলে বল, বর্ণ, প্রীতি, ওজঃ ও সৌরভ বর্দ্ধিত হয় এবং স্বেদ, দুর্গন্ধ, বিবর্ণতা ও শ্রান্তি নষ্ট হয়; মুখে অনুলেপন করিলে চক্ষু দৃঢ় এবং গণ্ডস্থল ও বদন পীন ও কমনীয় হয়; ইহাদ্বারা ব্যঙ্গ-বিড়কাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে। পুষ্প, বস্ত্র ও রত্ন ধারণ করিলে রক্ষোগ্রহনাশ, ওজোবৃদ্ধি, সৌভাগ্য এবং প্রীতি বর্দ্ধন হয়। কেশপ্রসাধন করিলে অর্থাৎ চিরুণী দ্বারা

চুল আঁচড়াইলে কেশের উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং ধূলি মল ও উৎকুণাদি অপগত হইয়া যায়।

অতঃপর দেবতা, অতিথি ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া আহার করিবে। হিতকর দ্রব্য পরিমিত মাত্রায় আহার করা উচিত। আহার দ্বারা প্রীতি ও বল বর্দ্ধিত হয়, দেহ পুষ্ট হয় এবং আয়ু, তেজ, উৎসাহ, স্মৃতি, ওজঃ ও অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আহারের পর কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করা আবশ্যক।

অপরাহ্নে **পরিভ্রমণ** অর্থাৎ পায়চারি করা হিতকর। পায়চারি করিলে আয়ু, বল, মেধা ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয় এবং ইন্দ্রিয়সমূহের জড়তা বিনষ্ট হয়। ভ্রমণকালে পাদুকা, ছত্র, দণ্ড ও উষ্ণীষ-ধারণ কর্ত্তব্য। পাদুকাধারণ করিলে পাদরোগের নাশ, শুক্রবৃদ্ধি, প্রীতি ও ওজোবৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং গমনে আরাম পাওয়া যায়। বিনা পাদুকায় ভ্রমণ করিলে স্বাস্থ্যহানি, আয়ুক্ষয় ও চক্ষুর অপকার হইয়া থাকে। ছত্রধারণে বর্ষা, বায়ু, ধূলি, রৌদ্র ও হিমাদির নিবারণ, বর্ণের উজ্জ্বলতা, চক্ষুর জ্যোতিঃ ও ওজঃপদার্থের বৃদ্ধি হয়। দণ্ডধারণ দ্বারা বল, স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য বর্দ্ধিত হয়। উষ্ণীষ (পাগড়ী) ধারণ করিলে দেহের পবিত্রতা, কেশের সৌন্দর্য্য এবং বায়ু, আতপ ও ধূলির নিবারণ হইয়া থাকে।

রাত্রিকালে পরিমিত মাত্রায় উপযুক্ত সময়ে নিদ্রা সেবন করিলে বল, বর্ণ, পুষ্টি, উৎসাহ ও অগ্নি বর্দ্ধিত ও তন্দ্রা দূর হয় এবং ধাতুর সমতা হইয়া থাকে।

সদ্‌বৃত্তি

গুরুজনের ও বৃদ্ধগণের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণের নিন্দা করিবে না। প্রাণিগণের উপকারী হইবে।

পরিচিত ও আত্মীয় ব্যক্তির সহিত দেখা হইলে অগ্রে সম্ভাষণ করিবে। উপযুক্ত কালে হিত, মধুর ও পরিমিত কথা কহিবে। কাহারও প্রতি বিদ্বেষবাক্য বা মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিবে না।

গুরুজনের নিকট উচ্চ আসনে বসিবে না। সভাস্থলে জৃম্ভণ (হাই), উদ্গার, হাঁচি ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিবে না। স্তম্ভাদিতে ঠেস দিয়া উপবেশন করিবে না। উৎকটুক (উবু) হইয়া কিম্বা রুদ্ধ আসনে বসা উচিত নহে। বিষম-ভাবে গ্রীবাদেশ রাখিবে না। গাত্র, নখ, মুখাদি বাজাইবে না। অকারণে কাষ্ঠ, লোষ্ট্র ও তৃণাদি অভিহনন করিবে না বা ভাঙ্গিবে না।

মুখের ফুৎকার দ্বারা অগ্নি জ্বালিবে না। জলে আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করিবে না। উলঙ্গ হইয়া জলে প্রবেশ করিবে না।

দ্যূতক্রীড়া করিবে না। মাদকদ্রব্য সেবন করিবে না। গীতবাদ্যাদিতে আসক্তি রাখিবে না। অন্যের জামীন বা সাক্ষী হইবে না। নিদ্রা, জাগরণ, শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, যান,

হাস্য, কথন, মৈথুন ও ব্যায়ামাদি কোন বিষয়েরই অতি সেবা করিবে না।

হিতকর আহার অভ্যাস করিবে। বহুজনস্পৃষ্ট অন্ন বা পণিকের (হোটেল-ওয়ালার) অন্ন ভোজন করিবে না। হস্তপদাদি ধৌত না করিয়া আহার করিবে না। দিবারাত্রির সন্ধি-সময়ে অর্থাৎ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে এবং সময় অতীত করিয়া ও নিরাসনে আহার করিবে না। ভগ্নপাত্রে বা অঞ্জলিপুটে জলপান করিবে না।

লোম, নখ ঘন ঘন ছেদন করিবে না। মস্তকদ্বারা ভার বহন করিবে না। অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্র, মাল্য, পাদুকাদি ব্যবহার করিবে না। মল-মূত্রের উপস্থিত বেগ ধারণ করিবে না। অনুপযুক্ত স্থানে বা প্রকাশ্যভাবে মল-মূত্র ত্যাগ করিবে না।

অধিক স্ত্রী-সঙ্গম করিবে না। গ্রীষ্মকালে মাসে একদিন এবং অন্যান্য ঋতুতে প্রতি মাসে তিনদিন অন্তর স্ত্রী-সঙ্গম বিহিত। রজস্বলা, অকামা, মলিনা, অপ্রিয়া, উচ্চবর্ণা, বয়োজ্যেষ্ঠা, হীনাঙ্গী, ব্যাধিপীড়িতা, গর্ভিণী, যোনিরোগগ্রস্তা, সগোত্রা, গুরুপত্নী, অগম্যা ও প্রব্রজিতা নারীতে গমন করিবে না। প্রাতঃকালে, অর্দ্ধরাত্রিতে, মধ্যদিনে এবং লজ্জাবহ, অনাবৃত বা কলুষিত স্থানে স্ত্রীসঙ্গম করিবে না। রমণকালে ললাটদেশ অনাবৃত রাখিও না। উর্দ্ধভাবে (দাঁড়াইয়া) অথবা চিৎ হইয়া পুরুষের সঙ্গম করা উচিত নহে। তির্য্যগ্-

যোনিতে বা যোনি ভিন্ন অন্ন ছিদ্রে মৈথুন করিলে বিবিধ অনিষ্ট হইয়া থাকে। মলবেগ বা মূত্রবেগে পীড়িত হইয়া স্ত্রীসহবাস করিলে শুক্রাশ্মরী (পাথুরী) রোগ উৎপন্ন হয়। স্ত্রীসঙ্গমের পরে মধুর ভক্ষ্যদ্রব্য, শর্করামিশ্রিত দুগ্ধ ও মাংসরস প্রভৃতি দ্রব্যের পানভোজন এবং স্নান, ব্যজন ও নিদ্রা বিশেষ উপকারী।

ঋতুচর্য্যা

বর্ষাকালে মানবগণের শরীর ক্লিন্ন হয় এবং অগ্নি মন্দ হয়। তজ্জন্য বাতাদি দোষও প্রকুপিত হইয়া উঠে। অতএব তৎকালে উক্ত দোষের প্রতিকারজন্য কষায়, তিক্ত ও কটুরসবিশিষ্ট, অদ্রব, অনতিস্নিগ্ধ, অনতিরুক্ষ, উষ্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধক অন্ন ভোজন করিবে। জল উত্তপ্ত করিয়া শীতল হইলে অল্পমাত্রায় পান করিবে। অধিক ব্যায়াম, মৈথুন, আতপ, দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিবে। ভূবাষ্পের পরিহারজন্য দ্বিতল গৃহে বা খট্টাদিতে স্থূলবস্ত্রাবৃত হইয়া শয়ন করিবে। বৃষ্টির জল বা জলো হাওয়া শরীরে লাগাইবে না। এই সময়ে বাতনাশক দ্রব্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

শরৎকালে কষায়, মধুর ও তিক্তরস, দুগ্ধজাত দ্রব্য, ইক্ষুরসজাত দ্রব্য, মধু, শালি-তণ্ডুল, মুগাদির যূষ ও জাঙ্গল মাংসরস ভোজন করিবে। নির্ম্মল জল পান করিবে। জলে সন্তরণ, সন্ধ্যাকালে চন্দ্রকিরণ সেবন, গাত্রে চন্দনাদির

অনুলেপন ও অধিবাসন-ক্রিয়া হিতকর। তিক্তঘৃত পান, রক্তমোক্ষণ ও বিরেচন ক্রিয়া দ্বারা সঞ্চিত পিত্তের নির্হরণ করা আবশ্যক। পিত্তনাশক দ্রব্যসমূহের সেবন কর্ত্তব্য। তীক্ষ্ণ, অম্ল, উষ্ণ ও ক্ষারদ্রব্য ভোজন এবং দিবানিদ্রা, রাত্রি-জাগরণ ও আতপসেবন পরিত্যাগ করিতে হইবে।

হেমন্ত ও **শিশিরকাল** শীতল এবং রুক্ষ। এই সময়ে সূর্য্যতেজ মৃদু হয়, বায়ু প্রবল ও প্রকুপিত হইয়া এবং শীতস্পর্শে জঠরাগ্নি পিণ্ডীভূত হইয়া উদরস্থ রসধাতুর শোষণ করিতে থাকে। সুতরাং হেমন্তকালে স্নিগ্ধ অর্থাৎ ঘৃততৈলান্বিত খাদ্য এবং লবণ, ক্ষার, তিক্ত, মধুর ও কটুরসবহুল ভোজ্য ভোজন করিবে। তিল, মাষকলাই, শাক, দধি, ইক্ষুজাত দ্রব্য, পুরাতন বা নূতন শালি-তণ্ডুল এবং সকল প্রকার মাংস প্রভৃতি বলকর খাদ্যসমূহ ভোজন করিতে পারা যায়। উষ্ণজল পান ও উষ্ণজলে স্নান হিতকর। হেমন্ত ও শীতকালে যথেচ্ছভাবে অধিক স্ত্রীসহবাসেও বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় না। এই সময়ে শৈত্যহেতু মানবগণের শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া থাকে।

বসন্তকালে সেই শ্লেষ্মা উষ্ণস্পর্শে কুপিত হইয়া উঠে। সেইজন্য তৎকালে অম্ল, মধুর ও লবণরসবিশিষ্ট এবং স্নিগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন ত্যাগ করা আবশ্যক। বমনাদি ক্রিয়াদ্বারা শ্লেষ্মা নির্হরণ প্রয়োজন। যষ্টিক ধান্যের ও যবের অন্ন, শীতবীর্য্য দ্রব্য, মুগের যূষ, নীবার ও কোদ্রব ধান্যের

অম্ল, লাবাদি পক্ষীর মাংসরস এবং পটোল, নিম, বেগুন, তিক্ত, কটু, ক্ষার, কষায়, রুক্ষ ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন ; মধ্বাসব, অরিষ্ট, মাধ্বীক, সীধু ও আসব পান ; ব্যায়াম, নেত্রাঞ্জন, তীক্ষ্ণ ধূমপান ও কবলধারণ এবং ঈষদুষ্ণ জলে স্নান ও ঈষদুষ্ণ জল পান হিতকর। এই সময়ে উপবনে ভ্রমণ করিলে উপকার হইয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালে ব্যায়াম, পরিশ্রম, উষ্ণসেবা, মৈথুন, শোষণ-কারক অন্ন এবং কটু, অম্ল ও লবণরসবিশিষ্ট ভোজ্য ভোজন পরিত্যাগ করিবে। সরোবর ও নদী প্রভৃতিতে স্নান, মনোরম কাননে ভ্রমণ, চন্দনাদি অনুলেপন, কমল ও উৎপলাদির মাল্য বা মুক্তা প্রভৃতির হার ধারণ, তালবৃন্তের বায়ুসেবন, শীতলগৃহে বাস এবং লঘুবস্ত্র পরিধান কর্ত্তব্য। সুগন্ধি ও সুশীতল শর্করাপানক বা খণ্ডপানক (খাঁড় গুড়ের পানা) ও শর্করামিশ্রিত মন্থ পান এবং ঘৃতমিশ্রিত শীতল, মধুর, দ্রবপ্রায় পদার্থ ভোজন হিতকর। স্নিগ্ধ দুগ্ধ চিনি-মিশ্রিত করিয়া রাত্রিকালে পান করিবে এবং উচ্চস্থানে (ছাদ প্রভৃতি) প্রস্ফুটিত-কুসুমাকীর্ণ শয্যায় চন্দনলিপ্ত শরীরে শয়ন করিয়া সুখস্পর্শ সমীরণ সেবন করিবে।

যৌগিক প্রক্রিয়া

স্বরশাস্ত্রোক্ত নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিলে শরীর-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ফল পাইবে।

প্রত্যহ প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়াই নাসিকার দ্বারা শীতল জল পান করিবে। একটা প্রশস্ত বাটীতে জল লইয়া নাসিকা ডুবাইয়া ধীরে ধীরে পান অভ্যাস করিবে। ইহাতে সর্দ্দি লাগিবে না, মাথা ধরিবে না এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা থাকিবে।

নিদ্রা হইতে উঠিয়াই মুখে যত জল ধরে, তাহা লইয়া চক্ষে ২০।২২টা জলের ঝাপটা দিবে। আহার করিয়া আচমনান্তে ৭।৮টা জলের ঝাপটা দিয়া চক্ষু ধুইবে। কোন কারণে মুখ ধুইতে হইলে চক্ষু ধুইতেও ভুলিবে না। তৈল মাখিবার সময় সর্ব্বাগ্রে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ তৈল দ্বারা পূর্ণ করিবে। ইহাতে চক্ষু সতেজ ও বহুদিন কার্য্যক্ষম থাকিবে এবং কোনরূপ চক্ষুরোগ জন্মিবে না।

মলমূত্রত্যাগের সময় দন্তে দন্তে একটু জোরে চাপিয়া ধরিবে। যতক্ষণ মলমূত্র নিঃসরণ হয়, ততক্ষণ ঐরূপ করিয়া থাকিলে শীঘ্র দাঁত পড়িবে না এবং বহুকাল কার্য্যক্ষম থাকিবে।

আহারের সময় এবং মলত্যাগকালে দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাসবহন এবং জলপান ও প্রস্রাবের সময় বামনাসাপুটে শ্বাসবহন করিলে কোন রোগ জন্মিতে পারে না। বিশেষতঃ অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি রোগ থাকিলেও উপকার হইবে। যে নাকে শ্বাস প্রবাহিত করিতে হইবে, তাহার বিপরীত পার্শ্বে শয়ন করিলেই শ্বাস পরিবর্ত্তিত হইবে।

আহারের পর চিরুণী দ্বারা (রবারের না হয়) ৪।৫ মিনিট মাথা আঁচড়াইলে বাত, শিরঃপীড়া প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে না। চিরুণী এরূপভাবে চালনা করিবে, যেন মস্তকের চর্ম্মে কাঁটাগুলি একটু জোরে ঘর্ষিত হয়। ইহাতে চুল পাকে না।

আহারের পর পায়ের পাতা পশ্চাতে মুড়িয়া তাহার উপর ১০।১৫ মিনিট বসিয়া থাকিলে বাতব্যাধি জন্মিতে পারে না।

প্রত্যহ একচিত্তে শ্বেত, কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণের ধ্যান করিলে বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিধাতু সাম্য থাকে।

প্রত্যহ নাভিতে বায়ু ধারণ ও নাভিকন্দ ধ্যান করিলে পরিপাকশক্তি ও জঠরাগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

ললাটোপরি পূর্ণচন্দ্রসদৃশ জ্যোতিঃ ধ্যান ও গব্যঘৃতে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন করিলে আয়ু বৃদ্ধি হয়।

যে কোন ব্যাধির আক্রমণ বুঝিতে পারিলে তদ্দণ্ডেই যে নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে, সেই নাসিকাটি উত্তমরূপে (আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত) বন্ধ করিয়া রাখিবে।

প্রত্যহ দিবাভাগে বামনাসায় ও রাত্রিকালে দক্ষিণনাসায় শ্বাস বহন রাখিতে পারিলে নীরোগ, দীর্ঘজীবী ও চিরযুবা হওয়া যায়।

ঔষধ ও চিকিৎসা

যাহারা শিক্ষার দোষে, বয়সের চাপল্যে এবং কুসংসর্গে পড়িয়া অত্যাচারের নরকবহ্নিতে ঝাঁপ দিয়াছে, আত্মশক্তি বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, শুক্র অত্যন্ত তরল হইয়াছে এবং ধারণাশক্তি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, ব্রহ্মচর্য্যপালন ব্যতীত তাহাদের গত্যন্তর নাই। স্বপ্নবিকার, ধাতুদৌর্ব্বল্য প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য কুৎসিত রোগ জন্মিলে আর উপায় নাই ;—ঔষধে এ রোগ আরোগ্য হয় না। ইহার একমাত্র উপায়, একমাত্র চিকিৎসা—ব্রহ্মচর্য্যপালন। তাহারা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য পালন ও নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিবে।

প্রত্যহ শয়নের পূর্ব্বে শীতল জল দ্বারা কোমর পর্য্যন্ত ধুইয়া ফেলিবে। তাহাতে অশক্ত হইলে হস্ত, পদ, নাভি, নিম্ন উদর ও স-অণ্ডকোষ

জননেন্দ্রিয় ধুইবে। পরিষ্কার শয্যায় শয়ন করিয়া ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রা যাইবে এবং অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিবে।

ল্যাঙ্গোট বা কৌপীন ব্যবহার করিবে। অণ্ডকোষকে নিম্নে দোলায়মান অবস্থায় এবং জননেন্দ্রিয়কে ঊর্দ্ধভাগে স্থাপিত করিয়া সজোরে ল্যাঙ্গোট পরিধান করিবে। পরিধেয় ল্যাঙ্গোট দিবারাত্রে তিন চারি বার পরিবর্ত্তন করিবে।

জলে নাভি পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দুই চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা ভূমি অবলম্বন পূর্ব্বক দুই গুল্ফ (গুড়মুড়া) অবলম্বন ব্যতিরেকে শূন্যে রাখিয়া ঐ দুই গোড়ালির উপরে গুহ্যদেশ স্থাপন করিবে এবং গুহ্যদেশ পুনঃ পুনঃ আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিবে।

শয়নের পূর্ব্বে প্রত্যহ ২ রতি কর্পূরচূর্ণ ও ৪ রতি কাবাবচিনিচূর্ণ সেবন এবং উদর পূর্ণ করিয়া শীতল জল পান করিবে।

পিপ্পলী ও সৈন্ধব লবণের সহিত ছাগমাংস, ঘৃত ও দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলে বীর্য্যবৃদ্ধি হয়।

তুলসীর শিকড় বীর্য্যবর্দ্ধক।

ভূমিকুষ্মাণ্ডের ফল ও মূল চূর্ণ করিয়া ২ তোলা মাত্রায় ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও যুবার ন্যায় হয়।

আমলকীর চূর্ণ আমলকীর রসে ভাবনা দিয়া চিনি ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া রাত্রির প্রথমভাগে মধুর সহিত লেহন করিয়া খাইলে পুরুষত্ব বৃদ্ধি হয়।

অতি পুরাতন শিমুল গাছের মূলের রস চিনির সহিত সেবন করিলে বীর্য্য বর্দ্ধিত হয়।

মাষকলাই প্রথমে ঘৃতে ভাজিয়া দুগ্ধে সিদ্ধ করতঃ চিনির সহিত প্রতিদিন সেবন করিলে বীর্য্য দৃঢ় হয়।

চারা শিমূলগাছের মূলের চূর্ণ ও তালমূলী চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া ১ তোলা মাত্রায় ঘৃত ও দুগ্ধসহ সেবন করিলে বীর্য্যস্তম্ভন হয়।

ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ ২০ তোলা উক্ত ২০ তোলা রসে ভাবনা দিয়া ২০ তোলা গব্যঘৃত ও ১২ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় প্রতিদিন প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিলে মেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগ আরোগ্য ও পুরুষত্ব বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অপাঙ্গ, বচ, শুণ্ঠী, বিড়ঙ্গ, শুলকা, শতমূলী, গুলঞ্চ ও হরিতকী এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া ঘৃত দ্বারা ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

শরৎকালে চিনির সহিত, হেমন্তে শুণ্ঠীচূর্ণের সহিত, শীতে পিপ্পলীর সহিত, বসন্তে মধুর সহিত, গ্রীষ্মে ইক্ষুগুড়ের সহিত, বর্ষায় সৈন্ধব লবণের সহিত হরিতকী ভক্ষণ করিলে বলবীর্য বৃদ্ধি হয়, সর্ব্বদা শরীর নীরোগ ও স্থিরযৌবন থাকে।

অশ্বগন্ধা, যমানি, নিমুথা, কুড়, ত্রিকটু, শুলকা, শুণ্ঠী, সৈন্ধব এই সকল সমভাগে এবং ইহাদের অর্দ্ধ লাল বচ লইয়া সমুদয় একত্র চূর্ণ করতঃ ২ তোলা মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত ভক্ষণ করিবে। এই ঔষধ জীর্ণান্তে দুগ্ধ পান করিবে। ইহাতে অতিশয় মেধাবৃদ্ধি হয়।

তালমূলী, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, গোধূম, শাল্মলী, কুটজ, গোক্ষুর, বালামূল, বানরীবীজ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। অনন্তর ৩ পল মহিষীদুগ্ধে বাটিয়া ১ পল চিনি মিশাইয়া তিন সপ্তাহ সেব্য। অনুপান মুথার ক্ষীর ও পথ্য পক্ষিমাংস। এই ঔষধ অতিশয় তেজস্কর, পুষ্টিকর এবং বীর্য্যবর্দ্ধক।

সমাপ্ত

ওঁ কৃষ্ণার্পণমস্তু

৭ কুম্ভযোগ ও সাধুমহাসম্মিলনী

এই গ্রন্থে কুম্ভযোগ, তাহার স্থান ও সময়, সাধুসম্মিলনী কি উদ্দেশ্যে কাহার কর্তৃক স্থাপিত, সাধকগণের বিবরণ প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। ১৩২১ হরিদ্বার কুম্ভমেলার বিস্তৃত বিবরণ। চতুর্থ সংস্করণ, মূল্য ২.০০।

৮ তত্ত্বমালা—প্রথম খণ্ড

শক্তিতত্ত্ব, গায়ত্রীতত্ত্ব, দেবতাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব, মহাবিদ্যাতত্ত্ব, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা, শারদীয়া ও কালী প্রভৃতি শাক্তসম্প্রদায়ের প্রচলিত যাবতীয় পূজা-পার্ব্বণ ও উৎসবাদির তত্ত্ব-বিশ্লেষণ। পঞ্চম সংস্করণ, মূল্য ২.৫০।

৯ তত্ত্বমালা—দ্বিতীয় খণ্ড

ভগবত্তত্ত্ব, অবতারতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ানুষ্ঠিত উৎসবাদির তাত্ত্বিক বিবৃতি।

পঞ্চম সংস্করণ

মূল্য ৩.০০

১০ তত্ত্বমালা—তৃতীয় খণ্ড

আত্মতত্ত্ব, সাংখ্যযোগতত্ত্ব, যোগনিদ্রাতত্ত্ব, নিবৃত্তিতত্ত্ব, সেবাতত্ত্ব, স্বপ্নতত্ত্ব, মৃত্যুতত্ত্ব, অশৌচতত্ত্ব, উৎসবতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব ইত্যাদি হিন্দুর সাধনা-সম্পর্কিত বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিশ্লেষণ ও আলোচনা। চতুর্থ সংস্করণ, মূল্য ৩.০০ মাত্র।

১১ সাধকাষ্টক

এই গ্রন্থে আটজন গৃহস্থ সাধুর পূতজীবন-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তক চরিত্র-গঠন ও ধর্ম্মলাভে বিশেষ সহায়তা করিবে।

চতুর্থ সংস্করণ

মূল্য ২.০০ মাত্র।

১২ বেদান্ত-বিবেক

ইহাতে নিত্যানিত্যবিবেক, দ্বৈতাদ্বৈত-বিবেক, পঞ্চকোষ-বিবেক, আত্মানাত্ম-বিবেক ও মহাবাক্য-বিবেক এই কয়েকটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য ২.০০ মাত্র।

১৩ শিক্ষা

শিক্ষার আদর্শ, সমস্যা, সমাধান, প্রয়োগ—এই পর্ব্বচতুষ্টয়ে বিভক্ত। শিক্ষাকে অধ্যাত্মদৃষ্টি দিয়া দেখিবার ইহা অভিনব প্রয়াস। ৩য় সংস্করণ, মূল্য ৫.০০ মাত্র।

১৪ উপদেশরত্নমালা

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিমূলক কতকগুলি আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ উপদেশের সমাহার। সপ্তম সংস্করণ, ০.৭৫ মাত্র।

১৫ স্তোত্রমালা

সারস্বত মঠে পঠিত স্তোত্রসমূহের সংগ্রহ। বড় বড় অক্ষরে পরিষ্কার ছাপা। দ্বাদশ সংস্করণ, ১.০০ মাত্র।

১৬ শ্রীশ্রীনিগমানন্দের জীবনী ও বাণী

শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত জীবন-কথা, আত্মপরিচয়, তত্ত্বোপদেশ ও অভয়বাণীর অপূর্ব্ব সমাবেশ।

ষষ্ঠ সংস্করণ, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তি ও হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি সহ মূল্য ৯.০০ মাত্র।

১৭ অভয়বাণী

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ পরমহংসদেব-কর্তৃক তদীয় শিষ্য-ভক্তবৃন্দসমীপে লিখিত ও শ্রীমুখ-কথিত আশা ও উদ্দীপনাপূর্ণ বাণীসমূহের সংগ্রহ। মূল্য ১.০০ মাত্র।

১৮ নিগম-বাণী

শ্রীমদাচার্য্য স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব-লিখিত পত্রাবলী হইতে সার্ব্বভৌম বাণীসমূহের সঙ্কলন।

৩য় সংস্করণ, ১.০০ মাত্র।

১৯ কীর্ত্তনমালা

সারস্বত মঠ, আশ্রম ও তদন্তর্গত সঙ্ঘসমূহে গীত কীর্ত্তন ও সঙ্গীতসমূহের অপূর্ব্ব সমাবেশ। চতুর্থ সংস্করণ মূল্য ৫.০০ মাত্র।

২০ শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-উপদেশামৃত

শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব কর্তৃক তদীয় শিষ্য-ভক্তগণকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রদত্ত অমূল্য উপদেশ-বাণীর অপূর্ব্ব সমাবেশ। অমৃতের মতই মধুর। দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ৫.০০ মাত্র।

২১ নিগম-প্রসাদ

শ্রীশ্রীনিগমানন্দদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমৃতময়ী তত্ত্ববাণী। মূল্য ২.০০

২২ শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্বসঙ্কলন

গুরুতত্ত্ব সম্পর্কে অভিনব গ্রন্থ। একাধারে বেদ-বেদান্ত দর্শন-পুরাণের সার নির্য্যাস এবং সাধনসিদ্ধ মহাপুরুষগণের মর্ম্মবাণীর অপূর্ব্ব সমাবেশ। মূল্য ৩'০০ মাত্র।

২৩ সঙ্ঘবাণী

সারস্বত সঙ্ঘের সম্যক্ পরিচয়, তাহার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও ভাবধারা, সঙ্ঘসেবীদের কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ। ২য় সংস্করণ, মূল্য ০'৭৫ মাত্র।

২৪ মনঃশিক্ষা

মনকে লক্ষ্য করিয়া উদ্‌ঘোষিত সাধনোপদেশ, অচঞ্চল ব্রাহ্মী-স্থিতিলাভের অব্যর্থ সঙ্কেত—শান্তির অমৃত নির্ঝর। ৩'০০

২৫ উৎকলতীর্থে

মনোরম ভাষায় উড়িষ্যার তীর্থসমূহের প্রাঞ্জল বিবরণ; বহু দার্শনিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যসমূহের প্রাণস্পর্শী সমাবেশ। মূল্য ৪'০০ মাত্র।

২৬ নীলাচলে ঠাকুর নিগমানন্দ

১৩৩০ সাল হইতে ১৩৪২ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের নীলাচলে অবস্থিতির মনোরম আলেখ্য। প্রথম খণ্ড ১৫'০০, দ্বিতীয় খণ্ড ১০'০০।

২৭ ভক্তসম্মিলনীর ভাষণ—মূল্য ১০'০০।

২৮ শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দের লৌকিক বিদ্যা ও অলৌকিক শক্তি—মূল্য ৭'০০। **২৯ উপনিষদ্ মনন** ১ম খণ্ড—মূল্য ৪'০০।

শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেবের হাফ্‌টোন প্রতিমূর্ত্তি

বড় সাইজ ১'৫০, মাঝারী সাইজ ০'৫০, ছোট ও কার্ড সাইজ ০.২৫।

—প্রাপ্তিস্থান—

(১) সারস্বত মঠ, পোঃ—হালিসহর (২৪ পরগণা)।

(২) সর্ব্বোদয় বুকস্টল, হাওড়া স্টেশন, পোঃ ও জেলা হাওড়া।

আর্য্য-দর্পণ

[সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র]

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের তত্ত্বাবধানে ব্রহ্মচারিসঙ্ঘ দ্বারা পরিচালিত ধর্ম্ম, নীতি ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র। ৬৯তম বর্ষ (১৩৮৩) চলিতেছে। বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৮'০০ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—**সারস্বত মঠ,** পোঃ—হালিসহর (২৪ পরগণা)।

সারস্বত মঠান্তর্গত শাখাশ্রম ও সঙ্ঘসমূহ হইতে প্রকাশিত

পুস্তকাবলী

ঠাকুরের চিঠি—শ্রীমদাচার্য্য স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেব কর্তৃক তদীয় শিষ্য-ভক্তগণ-সমীপে লিখিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ পত্রাবলী। ১ম খণ্ড ২'৫০, ২য় খণ্ড ২'০০, ৩য় খণ্ড ২'০০। ঐ (স্বাঃ সঃ প্রতি) ৩'০০।

সম্মিলনীর চিঠি—১৩৩৮ হালিসহর ভক্ত-সম্মিলনীর বিস্তৃত বিবরণ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত উপদেশ। মূল্য ১'৫০।

ঠাকুর হরিদাস—শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ নাম-সাধনার মূর্ত্ত বিগ্রহ ঠাকুর হরিদাসের পূত জীবন-কথা। ০'৫০।

হিন্দুধর্ম ০'২৫। **জয়গুরুনামমাহাত্ম্যকীর্ত্তনম্** ০'২০।

সদ্‌গুরু নিগমানন্দ—শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন-বিশ্লেষণ। মূল্য ১'৫০।

সেবকের দিনলিপি—সাধকের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণের বাণী। ১ম খণ্ড ১'৫০, ২য় খণ্ড ১'৫০, ৩য় খণ্ড ১'৫০।

নিগমস্মৃতি—পদ্যচ্ছন্দে ঠাকুরের জীবন-কথা। মূল্য ০'৫০।

শ্রীশ্রীগুরুগীতা—সংস্কৃত মূল ও তাহার প্রাঞ্জল পদ্যানুবাদ। ০'৭৫।

আচার্য্যপ্রসঙ্গ—শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দ পরমহংসদেব-সম্পর্কিত। গুরু-শিষ্য বা ভক্ত-ভগবানের মধুর লীলার উজ্জ্বল প্রকাশ। মূল্য ১'৫০।

আমি কি চাই—০'৫০। **নিয়মপঞ্চক**—০'৫০।

হিন্দুবোধন—ঘুমন্ত জাতির জাগরণের বিদ্যুদ্দণ্ড। মূল্য ১'৫০।

আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবন-গঠনোপযোগী উপদেশরাশিতে সমলঙ্কৃত—প্রতি গৃহে রাখার উপযুক্ত। মূল্য ১০'০০।

নিত্যলোকের ঠাকুর—শ্রীশ্রীঠাকুর-অঙ্কিত "জ্ঞানচক্রের" মর্ম্মাভাস, ভাবলোক বা নিত্যলোকের অপূর্ব্ব বর্ণনাসহ অভিনব গ্রন্থ। মূল্য ১'৫০।

মৃত্যু, পরকাল ও গতি সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর—১'৫০।

কামাখ্যায় কুমারীপূজা—পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক তথ্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ। শেষাংশে কবিতায় 'কামাখ্যাদর্শন'। ১'৫০।

নিগমানন্দদর্শন—জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয়। ৭·০০।

প্রেমসেবোত্তরা গতি—অপূর্ব্ব ভাবরসমণ্ডিত রত্নহার। ৩·০০।

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-কথামৃত—১ম খণ্ড ৭·০০, ২য় খণ্ড ৩·০০, ৩য় ৩.০০

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুমহিমা—পদ্যছন্দে গুরুমাহাত্ম্য বর্ণনা। ০·৭৫।

মিলন-বাণী—পদ্যছন্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশাবলী। ১ম খণ্ড ১·৫০, ২য় খণ্ড ১·৫০।

ছন্দে অভয়বাণী—পদ্যছন্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের অভয়বাণী। মূল্য ১·০০।

অমিয় স্মৃতি—কবিতায় শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতি-তর্পণ। ০·৭৫।

কচির কূজন—কচি ও কাঁচাদের জীবনগঠনোপযোগী বিবিধ ছন্দে গাঁথা ২১টি সরস ও জ্ঞানগর্ভ কবিতার সমাবেশ। ০·৫০।

নীলাচলের পথে—শ্রীশ্রীঠাকুরের অমিয়স্মৃতিবিজড়িত বিরহবিধুর ভক্তপ্রাণের মর্ম্মনিঙাড়ী ভাবোচ্ছ্বাস। ০·৭৫।

সারস্বত মঠ ও স্বামী স্বরূপানন্দ—৫·০০। **ভক্তচরিতামৃত**—৫·০০। **আশীর্ব্বাণী**—১·০০। **শঙ্করের মত ও গৌরাঙ্গের পথ**—৩·০০। **ব্রহ্মচর্য্যপ্রসঙ্গ**—১ম ভাগ ৩·৫০, ২য় ভাগ ৩·০০। **পঞ্চদশী-প্রদীপ**—২·০০। **শ্রীকৃষ্ণ**—৫·০০। **শ্রীশ্রীঠাকুরমাহাত্ম্য**—৩·০০। **নিগমানন্দের আচার্য্য-অভিমান**—১·০০। **ঋষি নিগমানন্দ**—১·২৫। **শ্রীশ্রীনিগমানন্দ লীলালহরী**—৭·০০। **গুরুব্রহ্মের আসনপূজা**—২·০০। **ব্রহ্মাভ্যাস**—১·০০। নিগম-স্মৃতিরেখা [কাব্য]—২·০০। আচার্য-শিষ্যের পারম্পর্য—০·৫০। বেদান্তবিদ্ গুরুর বিকাশ ও বেদান্তধর্ম-প্রচার—২·০০। পুণ্যস্মৃতি [কাব্য]—২·৫০, পুরাতনী [কাব্য] ২·৫০।

—প্রাপ্তিস্থান—

১। আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, হালিসহর (২৪ পরগণা)

২। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৩। সর্বোদয় বুক ষ্টল, হাওড়া ষ্টেশন, পোঃ ও জেলা হাওড়া।